মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৪, সংখ্যা-১০

নভেম্বর ২০১৫ ইং, সফর ১৪৩৭ হি., কার্তিক ১৪২২ বাং

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

صفر المظفر ١٤٣٧ھ نوفمبر ٢٠١٥م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১১৯১৯১১২২৪

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :.................................. ৩

পবিত্র সুন্নাহ থেকে :

'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১১..... ৪

দরসে ফিকহ :

পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-২......... ৭

মুফতী শাহেদ রহমানী

হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১৩

মাওয়ায়েযে ফকীহুল মিল্লাত :

সুদের ভয়াবহতা : বাঁচার উপায়.........................১৪

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :

দ্বীনের দাঈ ও খাদেমদের পরস্পর সম্পর্ক-

কেমন হওয়া উচিত?.................................... ২০

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক

শরীয়তের দৃষ্টিতে চেহারার পর্দা ২৩

মুফতি শরীফুল আজম

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২২....... ৩০

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১৮....... ৩৬

মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪০

মলফূজাতে আকাবের.................................... ৪৬

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

এই ভয়াবহতার শেষ কোথায়!

এমনিতেই অস্থির জনপদ। সম্প্রতি এর সাথে যুক্ত হচ্ছে আরো নতুন নতুন মাত্রা। বোঝাই মুশকিল, দেশের ভবিষ্যৎ গন্তব্য কোন দিকে।

বাস্তবতার আলোকে বলা যায়, এ দেশের রাজনৈতিক গুম-খুনের মিছিল অতি দীর্ঘ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বালা-মুসিবতে হাজারো মানুষের প্রাণ হারানোর ঘটনা তো আছেই। আছে বিভিন্ন বিরোধ ও ঝগড়া-ফ্যাসাদে লাশ পড়ার ঘটনা। কিন্তু রাজনৈতিক গুম-খুন ও হত্যার ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই বেড়ে চলেছে। অথচ এটি মানুষের এখতিয়ারবহির্ভূত কোনো বিষয় নয়। বরং রাজনীতির বিষয়টি অনেকটা পরিকল্পিতই হয়ে থাকে। সে কারণে মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড সবচেয়ে বড় অপরাধ। মনে হবে, দেশের এক শ্রেণীর মানুষ অতিমাত্রায় রাজনীতিপ্রবণ বা রাজনীতিনির্ভর হওয়ায় এত বড় অপরাধকেও খুব একটা বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। সে কারণেই হয়তো এই মিছিল থামছে না। বরং লাশের পর লাশ যোগ হচ্ছে। রক্ত ঝরছে। যার যার মতো রাজনৈতিক বক্তৃতা-বিবৃতির গোলকধাঁধায় বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে মিছিলের পেছনের খবর। মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে অদম্য গতিতে।

সম্প্রতি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় যুক্ত হয়েছে আরো কিছু নতুন মাত্রা। গত ২৪ অক্টোবর ২০১৫ইং ১০ মুহাররমে শিয়া সম্প্রদায়ের তাজিয়া মিছিল বের করার প্রস্তুতির সময় ঢাকার হোসেনী দালান চত্বরে বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। তাতে একজন নিহত হয় এবং অনেকে আহত হয়। এর আগে ৩ অক্টোবর রংপুরে একজন জাপানি নাগরিক এবং ২৮ সেপ্টেম্বর গুলশানে একজন ইতালিয়ান নাগরিক হত্যার ঘটনা ঘটে।

এসব ঘটনাকে অনেকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে রূপ দিতে চাইলেও সরকারি ভাষ্য মতে, এগুলোও অপরাজনীতির একটি অংশ। প্রশাসনের অভিমত অনুযায়ী এগুলো পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

এ দেশে শত শত বছর ধরে বিভিন্ন ধর্ম ও দেশের হাজারো নাগরিকের সহাবস্থান। কোনো সত্যিকারের মুসলমান সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব করা তো দূরের কথা, তাদের সাথে অসদাচারণও করতে পারে না। কারণ ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শের নাম। দীর্ঘকাল ধরে মুসলমানদের বাস্তব আদর্শও এর প্রমাণ বহন করে। সুতরাং বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটিয়ে কেউ যদি একে সাম্প্রদায়িকতার রূপ দিতে চায়, তা হবে তাদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এবং দেশ ও ধর্মদ্রোহিতার পরিচায়ক।

দেশি-বিদেশি কোনো নাগরিক বা সম্প্রদায়, দেশ কিংবা ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করলে বিচারিক প্রক্রিয়ায় তার শাস্তি বিধানের অধিকার সরকারের আছে। কিন্তু গুপ্তহত্যা, নাশকতা, সন্ত্রাস ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম মানুষের জানমাল ও সম্মান রক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইসলামের কঠোর দণ্ডবিধি মানবসমাজের সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যই প্রতিষ্ঠিত ও নিবেদিত। সারা দুনিয়ায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়ার যে নীলনকশা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এর সাথেও ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম দেশে যারা এ ধরনের অপরাধে জড়িত, তাদের সাথেও ইসলামের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। সুতরাং এরূপ হত্যাকাণ্ড থেকে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ বের না করার আহ্বান আমাদের এবং মুসলিম উম্মাহের। এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে সকল মুসলমানকে সচেতন হতে হবে। সরকারকেও এসব বিষয়ে কঠোর থেকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাকি থাকল রাজনৈতিক কারণে যেসব আপদ-বিপদের শিকার পুরো দেশবাসী; তা কারো জন্য শুভ লক্ষণ নয়। ক্ষমতার রাজনীতির মধ্যে বিরোধ থাকতেই পারে। প্রতিযোগিতা তো থাকবেই। অনেক সময় প্রতিহিংসাও সৃষ্টি হবে। কিন্তু এর জন্য দেশের সাধারণ নাগরিককেই সব সময় বলি দিতে হবে–এটি অপ্রত্যাশিত।

বর্তমান সময়ে শিক্ষণীয় অনেক বাস্তবতা আমাদের সামনে। অপরাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতার চর্চা এবং বিদেশি ষড়যন্ত্রের কবলে অনেক মুসলিম দেশ এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। বলতে গেলে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, গোড়ামী, একগুঁয়ে মনোভাব, ধর্মবিমুখতা, স্বার্থপরতা এবং বিভিন্ন দেশের শ্যেন দৃষ্টিই এসব ধ্বংসযজ্ঞের মূল কারণ। অথচ এসব রাষ্ট্র একসময় মুসলমানদের জন্য ছিল আদর্শ রাষ্ট্র। অনেক অনেক সুখ-শান্তিতে বাস করত ওসব দেশের জনগণ। কয়েক বছরের ব্যবধানে এখন সাধারণ মানুষের বাস অযোগ্য হয়ে পড়েছে এসব জনপদ।

আল্লাহর অগণিত শোকর, পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল এই দেশ এখনো অনেক অনেক নিরাপদ। খুবই সুখ-শান্তিতে এ দেশের জনসাধারণ। এখনো এ দেশের মানুষের মাঝে পরস্পর মমত্ববোধ, স্নেহবোধ, ভক্তি-শ্রদ্ধা, শিষ্টাচার, সুন্নাতী জীবনযাপনের জযবা, ইবাদত-বন্দেগী, সদাচারের ন্যায় আরো অনেক মানবীয় গুণাবলি বিদ্যমান।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভিন্ন প্রকৃতির ঘটনাগুলো অভিজ্ঞ মহলকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলছে। ভাবিয়ে তুলছে দেশের আলেম-উলামাকেও। কী ঘটতে যাচ্ছে এ দেশের ভাগ্যে?

আমাদের আশা, বর্তমান পরিস্থিতিতে সকল রাজনৈতিক ধারা দেশ ও জনগণের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করবেন। কিভাবে রক্তপাতহীন রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করা যায়, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায় এবং বিশ্বকে একটি আদর্শ রাজনীতি উপহার দেওয়া যায়, সে চেষ্টাই করবেন রাজনৈতিক অভিজ্ঞ মহল। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

আরশাদ রহমানী
২৫/১০/২০১৫ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (٨) ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ (٩) ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (١٠)

৮। মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে। তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশক, না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব।

৯। সে বিতণ্ডা করে ঘাড় বাঁকিয়ে, লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করার জন্য; তার জন্য লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাকে আস্বাদ করাব দহন যন্ত্রণা।

১০। (সেদিন তাকে বলা হবে) এটা তোমার কৃতকর্মেরই ফল। কারণ আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না। (সূরা : হজ)

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওই সমস্ত লোকের কথা বলছেন, যারা ধর্ম সম্পর্কে কিছু না জেনে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহর ব্যাপারে বাগ্‌বিতণ্ডা করে। তারা সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গর্ব করে ঘাড় ঘুরিয়ে থাকে। সত্যকে বেপরোয়াভাবে তারা প্রত্যাখ্যান করে। যেমন ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর স্পষ্ট মু'জিযাগুলো দেখেও বেপরোয়ার সাথে তাঁকে অমান্য করে। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

واذا قيل لهم تعالو الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنٰفقين يصدون عنك صدودا۔

অর্থাৎ 'তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূল (সা.)-এর দিকে এসো, তখন মোনাফেকদেরকে তুমি তোমার নিকট হতে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে। আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন,

واذا قيل لهم تعالو يستغفرلكم رسول الله لووارء وسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون

অর্থাৎ 'যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা এসো আল্লাহর রাসূল (সা.) তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে তারা দম্ভভরে ফিরে যায়। (৬৩:৫)

হযরত লোকমান (আ.) স্বীয় পুত্রকে বলেছিলেন,

ولا تصعر خدك للناس

অর্থাৎ 'মানুষকে অবজ্ঞা করে তুমি তোমার মুখ ঘুরিয়ে নিও না। অর্থাৎ নিজেকে বড় মনে করে তাদেরকে দেখে অবজ্ঞা করো না। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

واذا تتلى عليه ايٰتنا ولى مستكبرا

"অর্থাৎ যখন তার কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৩১:৭)

ليضل এর لام টি لام عاقبت (পরিণামের লাম) অথবা لام تعليل (কারণ বোধক লাম)। কেননা কোনো কোনো সময় এর উদ্দেশ্য অপরকে পথভ্রষ্ট করা হয় না। সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য অস্বীকারই হবে। আবার ভাবার্থ এও হতে পারে, আমি তাকে এরূপ দুশ্চরিত্র এ জন্যই করে দিয়েছি যে সে যেন পথভ্রষ্টদের সর্দার হয়ে যায়। তার জন্য দুনিয়াতেও লাঞ্ছনা এবং অপমান রয়েছে, যা তার অহংকারের প্রতিফল। এখানে সে অহংকার করে বড় হতে চাচ্ছিল। আমি তাকে আরো ছোট করে দেব। এখানেও সে তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবে। আর আখেরাতেও জাহান্নাম তাকে গ্রাস করে ফেলবে। তাকে ধমকের সুরে বলা হবে, এটা তোমার কৃতকর্মের ফল। আল্লাহর সত্তা জুলুম হতে পবিত্র। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذٰب حميم ذق، انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به تمترون۔

অর্থাৎ "(ফেরেশতাদের বলা হবে) তাকে ধরো এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মস্তিষ্কের ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও। আর বলা হবে, আস্বাদ গ্রহণ করো, তুমি তো ছিলে সম্মানিত অভিজাত। এটা তো ওটাই যে বিষয়ে তুমি সন্দেহ করতে। (৪৪:৪৭-৫০)

ইবনু আবী হাতিম (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত হাসান (রহ.) বলেন, "আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে তাদেরকে দিনে ৭০ হাজার বার করে জ্বালানো হবে।"

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১১

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখানে ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে যিকির দ্বিতীয় অধ্যায় :

হাদীস নং ১৬ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :جَاءَ النَّحَّامُ بْنُ زَيْدٍ وَقَرْدَمُ بْنُ كَعْبٍ وَبَحْرِيُّ بْنُ عُمَيْرٍ، فَقَالُوا :يَا مُحَمَّدُ، أَمَا تَعْلَمُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا غَيْرَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، بِذٰلِكَ بُعِثْتُ، وَإِلٰى ذٰلِكَ أَدْعُو ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيهِمْ وَفِي قَوْلِهِمْ :قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً

(১৬) একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে তিনজন কাফের উপস্থিত হলো এবং জিজ্ঞেস করল, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি কি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদকে জানেন না (মানেন না)? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।) এই কালেমার সাথে আমি প্রেরিত হয়েছি, মানুষকে এই কালেমার দিকেই আহ্বান করি, এ সম্পর্কেই আয়াত নাজিল হয়েছে–

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً

(তাফসীরে ইবনে জারীর ৫/১৬৩ হা. ১৩১৩, দুররে মনসূর ৩/২৫৬)

হাদীসটির মান : হাসান

ক. এক হাদীসে বর্ণিত, যখন কোনো বান্দা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তখন আল্লাহ তা'আলা এর সমর্থন করেন এবং বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই...।

عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلٰى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :إِذَا قَالَ الْعَبْدُ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، قَالَ يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ :صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، قَالَ :صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، وَإِذَا قَالَ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَلَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، قَالَ :صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا، لِي الْمُلْكُ، وَلِيَ الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، قَالَ :صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي "قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ :ثُمَّ قَالَ الْأَغَرُّ شَيْئًا لَمْ أَفْهَمْهُ، قَالَ :فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ :مَا قَالَ؟ فَقَالَ :مَنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ

(সুনানে তিরমিযী ৫/৪৫৮ হা. ৩৪৩০, আ'মালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লা [নাসাঈ] ১২২ হা. ৩৫০, সুনানে ইবনে মাজাহ ৪/২৪৪ হা. ৩৭৯৪, সহীহে ইবনে হিব্বান ৩/১৩১ হা. ৮৫১, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫ হা. ৮)

হাদীসটির মান : সহীহ

(১৭)

وَأخرج الْأَصْبَهَانِيّ فِي التَّرْغِيب عَن لَيْث قَالَ :قَالَ عِيسَى بن مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلَام :أمة مُحَمَّد أثقل النَّاس فِي الْمِيزَان ذلت ألسنتهم بِكَلِمَة ثقلت على من كَانَ قبلهم :لَا إِلٰه إِلَّا الله

হযরত ঈসা (আ.) বলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের আমলসমূহ (হাশরের দিন মিজানের পাল্লায় এই জন্য) সবচেয়ে বেশি ভারী হবে যে, তাদের জবান এমন এক কালেমায় অভ্যস্ত, যা তাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওপর ভারী ছিল। তা হলো,

কালেমায়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।
(দুররে মানসূর ২/৪২৩)
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

(১৮)
وَأخرج أَبُو الشَّيْخ عَن ابْن عَبَّاس -رَضِي الله عَنْهُمَا :أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ :مَكْتُوب على بَاب الْجنَّة :إِنَّنِي أَنا الله لَا إِلٰه إِلَّا أَنا لَا أعذب من قَالَهَا
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, জান্নাতের দরজায় লিখিত আছে যে–
إِنَّنِي أَنا الله لَا إِلٰه إِلَّا أَنا لَا أعذب من قَالَهَا
আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, যে ব্যক্তি এই (কালেমা) বলতে থাকবে, আমি তাকে আজাব দেব না। (দুররে মানসূর ৫/৫৬০, মুসনাদুল ফিরদাউস ৪/১২২ হা. ৬৩৭৯)
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।
(১৯)
---عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ " :قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :إِنِّي أَنَا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي، مَنْ جَاءَنِي مِنْكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ بِالْإِخْلَاصِ دَخَلَ فِي حِصْنِي ,وَمَنْ دَخَلَ فِي حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জিবরাঈল (আ.) হতে বর্ণনা করেন যে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ইরশাদ ফরমান, আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। অতএব আমারই ইবাদত করো। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এখলাসের সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দিয়ে আসবে সে আমার দুর্গে প্রবেশ করবে। আর যে আমার দুর্গে প্রবেশ করবে, সে আমার আজাব হতে নিরাপদ হবে।
(হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/১৯২)
হাদীসটি হাসান লি শাওয়াহিদিহী।
এই হাদীসের অধীনে বর্ণিত হাদীস :
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ "
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়্যাতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে তার জন্য হারাম করে দেবেন।
(বুখারী ১/৬১ হা. ৪২৫, ১১৮৬, মুসলিম ১/১০৯ হা. ২৬৩, আল মু'জামুল কাবীর ১৮/২৯ হা. ৫০, সহীহে ইবনে খুযাইমা ৩/৭৭ হা. ১৬৫৩, সুনানুল কুবরা [বায়হাকী] ১০/১২৪ হা. ২০৩৯২)
হাদীসটির মান : সহীহ।
ক.
এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ তা'আলার গোস্বাকে দূর করতে থাকে যতক্ষণ দুনিয়াকে দ্বীনের ওপর প্রাধান্য না দেয় এবং যখন সে দুনিয়াকে দ্বীনের ওপর প্রাধান্য দিতে আরম্ভ করে আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে তুমি তোমার দাবিতে সত্যবাদী নও।
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ تَمْنَعُ الْعَبْدَ مِنْ سُخْطِ اللهِ مَا لَمْ يُؤْثِرُوا سَفْقَةَ دُنْيَاهُمْ عَلَى دِينِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ اللهُ :كَذَبْتُمْ
(আবু ইয়ালা ১/১২৪ হা. ৪০২১, আল কামেল ইবনে আদী ৫/২০, আল ইলাল ইবনে আবী হাতিম ২/১২০ হা. ১৮৭৫, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ৭/২৭৭ হা. ১২১৮৮)
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।
(২০)
أخرج الطَّبَرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْه والديلمي عَن عبد الله بن عَمْرو عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ :أفضل الذّكر لَا إِلَه إِلَّا الله وَأفضل الدُّعَاء الاسْتِغْفَار ثمَّ قَرَأَ (فَاعْلَم أَنه لَا إِلٰه إِلَّا الله واستغفر لذنبك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات)
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, সমস্ত যিকিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর সমস্ত দোয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো ইস্তিগফার। অতঃপর এর সমর্থনে সূরা মুহাম্মাদ-এর আয়াত তেলাওয়াত করেন–
فَاعْلَمْ أَنه لَا إِلَه إِلَّا الله واستغفر لذنبك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات
(মাযমাউয যওয়ায়েদ ১০/৮৪ হা. ১৬৮১৭, মুসনাদে দায়লামী ১/৩৫২ হা. ১৪১২, জামেউস সগীর ১০২৮)
হাদীসটির মান : গ্রহণযোগ্য
ক.
এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইউনুস (আ.)-কে যখন মাছ খেয়ে ফেলে তখন এর পেটে থাকা অবস্থায় তাঁর দোয়া ছিল–

مِنْ ذِكْرِ اللَّه

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ ফরমান প্রতিটি বস্তুর মরীচিকা দূর করার ব্যবস্থা আছে। আর অন্তরের মরীচিকা দূর হয় আল্লাহর যিকির দ্বারা। আল্লাহর আজাব থেকে নিষ্কৃতিদানে সর্বাধিক কার্যকর বস্তু হলো আল্লাহর যিকির।

(শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ১/৩৯৬ হা. ৫২২, আততারগীব ২/২৫৪ হা. ২২০৮)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

খ.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ لِلْقُلُوبِ صَدَأً ، قَالُوا :فَمَا جَلَاؤُهَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ :جَلَاؤُهَا الِاسْتِغْفَارُ

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, অন্তরেও মরচে ধরে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মরচে দূর করার ব্যবস্থা কী? রাসূল (সা.) বলেন, ইস্তিগফার করা।

(মুজামুস সগীর ১/১৮৪ হা. ৪৯৬, মু'জামুল আওসাত ৭/১১০ হা. ৬৮৯৪, আল কামেল ৭/২৯ - ১৯৬৮, শু'আবুল ঈমান ১/৪৪১ হা. ৬৪৯, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ১০/২০৭ হা. ১৭৫৭৫)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

(২২)

عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَا يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ يُرْجِعُ ذٰلِكَ إِلٰى قَلْبٍ مُوقِنٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, যেকোনো ব্যক্তি খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্যদান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অপর এক হাদীসে আছে, অবশ্যই আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন।

(মুজামুল কাবীর তবরানী ২০/৪৫ হা. ৭১, মুসনাদে আহমদ ৫/২২৯ হা. ২২০০, সুনানে ইবনে মাজাহ ১/১৮২ হা. ৩৭০, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৮ হা. ১৬)

হাদীসটির মান : সহীহ।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

لَا إِلٰهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِين

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৭)

যেকোনো ব্যক্তি এই শব্দগুলোর সাহায্যে দু'আ করবে তা অবশ্যই কবুল হবে।

قَالَ " :نَعَمْ دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ هُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ :(لَا إِلٰهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (الأنبياء : ٨٧) فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلا اسْتَجَابَ لَهُ

(মুসনাদে আহমদ ১/১৭০ হা. ১৪৬২, মুসনাদে আবু ইয়ালা ১/৩৬০ হা. ৭৬৮, তিরমিযী ২/১৮৮ হা. ৩৫০৫, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫০৫ হা. ১৮৬২, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ১/৪৩২ হা. ৬২০)

হাদীসটির মান : হাসান

(২১)

عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "عَلَيْكُمْ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَالِاسْتِغْفَارِ فَأَكْثِرُوا مِنْهُمَا، فَإِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ :أَهْلَكْتُ النَّاسَ بِالذُّنُوبِ، فَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَالِاسْتِغْفَارِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ أَهْلَكْتُهُمْ بِالْأَهْوَاءِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ "

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং ইস্তিগফার খুব বেশি করে পড়ো। কেননা শয়তান বলে, আমি মানুষকে গোনাহ দ্বারা ধ্বংস করেছি আর মানুষ আমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও ইস্তিগফার দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছে। যখন আমি দেখলাম (যে, কিছুই তো হলো না) তখন আমি তাদেরকে নফসানী খাহেশাত (অর্থাৎ বেদ'আত) দ্বারা ধ্বংস করেছি। অথচ তারা নিজেদেরকে হেদায়েতের ওপর আছে বলে মনে করতে থাকে।

(মুসনাদে আবী ইয়ালা ১/৯৯ হা. ১৩১, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ১০/২০৭ হা. ১৭৫৭৪, আল মাতালিব ৩/১৯৭ হা. ৩২৪৩)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ক.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةً، وَإِنَّ صِقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ

দরসে ফিক্বহ

পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-২

মুফতী শাহেদ রহমানী

ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ পোশাক :
বৈধ পোশাকের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) দুটি বিষয় নিষেধ করেছেন। এক. অপচয়। দুই. অহংকার প্রদর্শন। হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ، أَوْ مَخِيلَةٌ

তোমরা পানাহার করো, সদকা করো এবং পোশাক পরিধান করো, যতক্ষণ তা অপচয় ও অহংকার মিশ্রিত না হয়। (ইবনে মাজাহ ৩৬০৫)

এখানে লক্ষণীয় যে পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে যেসব উদাসীনতা দেখা যায়, এর সব কিছুই এই হাদীসের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে। কেননা পোশাক পরিধান, চালচলন ও ফ্যাশনের সব কয়টি পন্থাকে এক কথায় 'সীমালঙ্ঘন' বলা যায়। এই সীমালঙ্ঘনকেই শরীয়তের পরিভাষায় 'এসরাফ' বা অপচয় বলা হয়। এমনকি অহংকারবশত যেসব পোশাক পরিধান করা হয়, সেগুলোও 'এসরাফ'-এর অন্তর্ভুক্ত। এর পরও হাদীসে একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে বিধানের দৃঢ়তা বোঝানোর জন্য।

পোশাক নিষিদ্ধ হওয়ার মূলনীতি
সাধারণত তিনটি কারণে কোনো পোশাক নিষিদ্ধ হতে পরে। প্রথমত, খোদ কাপড়টি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। যেমন অবৈধ অর্থে কেনা কাপড়, এমন পাতলা কাপড়–যার ফলে লজ্জা স্থান প্রকাশ পায়, আঁটসাঁট পোশাক যার ফলে বিভিন্ন অঙ্গের অবস্থান ও দৈহিক গঠন স্পষ্ট বোঝা যায়। তাছাড়া নারী-পুরুষ একে-অন্যের সাদৃশ্যপূর্ণ, কাফের, মুশরিক ও পাপাচারীদের অনুকরণে পোশাক পরিধান করা হারাম। পুরুষের জন্য স্বর্ণখচিত ও রেশমি কাপড় পরিধান করাও নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়, কাপড়টি গ্রহণ করা বৈধ। কিন্তু এর পরিধানের পদ্ধতি নিষিদ্ধ। যেমন পুরুষের জন্য টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা হারাম। নারীদের জন্য হাতের কবজি, পায়ের টাখনু ছাড়া অন্য অঙ্গ প্রদর্শন করা ও মাথার চুল খোলা রাখা নিষিদ্ধ। তৃতীয়, খোদ কাপড়টি গ্রহণ এবং এর পরিধানের পদ্ধতিও সঠিক। কিন্তু এই কাপড় পরিধানের উদ্দেশ্য ও নিয়্যাত বিশুদ্ধ নয়। যেমন খ্যাতি কিংবা লোক দেখানোর জন্য পোশাক পরিধান করা।

লজ্জা স্থান আবৃত না হওয়ার কয়েকটি পদ্ধতি
লজ্জা স্থান আবৃত করাকে আল্লাহ তা'আলা পোশাক পরিধানের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাই যেসব পোশাক দিয়ে লজ্জা স্থান আবৃত হয় না, ইসলামে সেগুলোকে পোশাকই বলা হয় না–অর্থ মূল্য ও সৌন্দর্য প্রকাশে তা যতই অভিজাত হোক না কেন। কেননা এর মাধ্যমে পোশাকের আসল উদ্দেশ্যই অর্জিত হয় না। (তাকমেলায়ে ফতহুল মুলহিম : ৪/৭৭)

নারী-পুরুষের সতর কতটুকু?
পুরুষের সতর নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। নারীদের চেহারা, পা ও দুই হাতের কবজি ছাড়া পুরো শরীর সতর। (যদিও এই তিনটি অঙ্গ পর্দার বিধানের অন্তর্ভুক্ত)

সতর ঢাকার জন্য তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক. পোশাক দ্বারা সতরের অঙ্গগুলোকে ভালোভাবে ঢেকে ফেলতে হবে। দুই. পোশাকটি মাত্রাতিরিক্ত পাতলা হতে পারবে না। তিন. একেবারে চিপাচাপা ও আঁটসাঁট পোশাক হতে পারবে না।

মাত্রাতিরিক্ত পাতলা কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ
ইসলামে এমন পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ, যা পরিধান করা সত্ত্বেও দেহের অঙ্গ দৃশ্যমান থাকে। এ ধরনের পোশাক পরিধানের কারণে মানুষকে বস্ত্রাবৃত হওয়া সত্ত্বেও বিবস্ত্র দেখায়। হাদীস শরীফে এ ধরনের পোশাক পরিধান করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত দাহয়া কালবী (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি কাপড় খণ্ড দিয়ে বলেছেন, এটাকে দুই টুকরো করবে। এক টুকরো দিয়ে একটি জামা সেলাই করবে। আর অন্য টুকরো তোমার স্ত্রীকে দিয়ে

জামাটি দুই পার্ট করে সেলাই করে নিতে বলবে, যাতে কাপড়ের নিচে চুল দেখা না যায়। (আবু দাউদ : ৪১১৬)

একবার বনী তামিম গোত্রের কিছু নারী হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে আসেন। তাঁরা পাতলা কাপড় পরিহিতা ছিলেন। এটা দেখে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন,

إِنْ كُنْتُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَيْسَ هَذَا بِلِبَاسِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَإِنْ كُنْتُنَّ غَيْرَ مؤمنات فتمتعينه

অর্থাৎ যদি তোমরা মুমিনা হও, তবে এগুলো মুমিনাদের পোশাক নয়। আর যদি তোমরা মুমিনা না হও, তাহলে এসব কাপড় উপভোগ করো। (কুরতুবি : ১৪/২৪৪)

একবার হযরত হাফসা বিনতে আবদুর রহমান (রা.) পাতলা কাপড়ের ওড়না পরিধান করে হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে আসেন। আয়েশা (রা.) সেই কাপড়টি ছিঁড়ে ফেলেন এবং তাঁকে একটি মোটা কাপড়ের ওড়না পরিয়ে দেন। (মোয়াত্তা ইমাম মালেক : ১৯০৭)

হযরত উসামা (রা.) বর্ণনা করেন যে একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে একটি কিবতী মোটা কাপড় পরিয়ে দেন। হযরত দাহয়া কালবী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কাপড়টি হাদিয়া দিয়েছিলেন। আমি এই কাপড়টি আমার স্ত্রীকে পরিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি কিবতী কাপড়টি পরিধান করো না কেন? আমি বললাম, এটি আমি আমার স্ত্রীকে পরতে দিয়েছি। রাসূল (সা.) বললেন, তাঁকে বলো, এর নিচে কোনো মোটা কাপড় লাগিয়ে নিতে। কেননা আমার আশঙ্কা হয়, এটি পরিধান করলে তাঁর হাড্ডির (দৈহিক) গঠন প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। (মুসনাদে আহমাদ : ২১৭৮৬)

হযরত জারীর (রহ.) থেকে বর্ণিত :

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْتَسِيَ وَهُوَ عَارٍ يَعْنِي الثِّيَابَ الرِّقَاقَ (شعب الايمان ٥٨٢٢)

অর্থাৎ বহু মানুষ পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও বিবস্ত্র থাকে। এটি হয়ে থাকে চিকনা ও পাতলা কাপড় পরিধান করার কারণে। উল্লিখিত আলোচনা থেকে জানা যায়, ইসলামে কেবল সতর ঢেকে রাখাই ওয়াজিব নয়, বরং সতরের অঙ্গগুলো মানুষের দৃষ্টির আড়ালে করে রাখা অপরিহার্য।

আঁটসাঁট ও চিপচাপ পোশাক পরিধান করা যাবে না

কখনো কখনো কাপড় এমন চিপে ও সংকীর্ণ হয় যে এতে করে সতরের অঙ্গগুলোর আকৃতি-গঠন, উত্থান-পতন দৃশ্যমান হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এটাও নগ্নতা ও বস্ত্রহীনতার নামান্তর। ইসলামী শরীয়তে এমন বস্ত্র পরিধান করা নিষিদ্ধ। আর এমন নগ্ন পোশাক পরিহিত কারো দিকে তাকানোও হারাম। এ বিষয়ে আল্লামা শামী (রহ.) লিখেছেন,

من تأمل خلف امرأة ورأى ثيابها حتى تبين له حجم عظامها لم يرح رائحة الجنة فرؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو كثيفا لاترى بشرة منه (رد المحتار ٣٦٦/٦)

অর্থাৎ : যে ব্যক্তি কোনো নারীর পোশাক নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে অতঃপর তার দৈহিক গঠন দেখতে থাকে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। তাই এমন কাপড় পরিহিত কাউকে দেখাও নিষিদ্ধ। কেননা এটি নিছকই কাপড় দেখা নয়, বরং সতরের অঙ্গগুলো দেখার শামিল। (রদ্দুল মুহতার : ৬/৩৬৬)

আমাদের সমাজে অনেক পুরুষ খুবই সংকীর্ণ ও দেহের সঙ্গে লাগিয়ে প্যান্ট পরিধান করে। এমনকি আধুনিক নারীরাও চিপা প্যান্ট পরে থাকে। উল্লিখিত বিধান অনুসারে এসব প্যান্ট পরিধান করা হারাম। একইভাবে চিপা ও চুড়ি পায়জামা পরিধান করাও নিষিদ্ধ। আর এমন পোশাক পরিহিত কাউকে দেখাও হারাম।

ইসলামে সতর ঢাকার গুরুত্ব :

কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে সতর ঢাকা ইসলামে ফরজ। আর এটি এমন ফরজ, যা কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরই তার জন্য প্রথম জরুরি কাজ। হযরত য়া'আলা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে খোলা ময়দানে বস্ত্রহীন অবস্থায় গোসল করতে দেখে তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন। অতঃপর হামদ ও ছানার পর তিনি বলেন,

ان الله عزوجل حيى ستير يحب الحياء والستر فاذا اغتسل احدكم فليستتر

অর্থাৎ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত লজ্জাশীল ও গোপনীয়তা অবলম্বনকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও গোপনীয়তা পছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন গোসল করে, সে যেন লজ্জা স্থান ঢেকে রাখে। (আবু দাউদ : ৪০১২)

ইসলামী শরীয়তে নির্জন ও জনারণ্যে সর্বাবস্থায় সতর ঢেকে রাখার প্রতি সবিশেষ তাগিদ দেওয়া হয়েছে। একটি হাদীসে বিষয়টি স্পষ্ট ফুটে

উঠেছে,

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ :إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ :اللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (ابوداود ٤٠١٧)

অর্থাৎ : হযরত বাহ্য বিন হাকীম (রা.) তাঁর বাবা থেকে, তাঁর বাবা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কার কাছে আমাদের লজ্জা স্থান গোপন রাখব, আর কার কাছে তা প্রকাশ করতে পারব? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তুমি তোমার স্ত্রী ও দাসীদের ছাড়া অন্যদের কাছে লজ্জা স্থান ঢেকে রাখো। আমি আবারো প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা কোথাও যদি গাদাগাদি করে অবস্থান করতে থাকে? (তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি সতর খুলে যায়, তখন আমরা কী করব?) রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সে ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব লজ্জা স্থান ঢেকে রাখতে চেষ্টা করবে। আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, নির্জন স্থানে বস্ত্রহীন হওয়ার হুকুম কী? তিনি উত্তর দিলেন, মানুষের চেয়েও আল্লাহর সঙ্গে লজ্জাশীল আচরণ করা অধিক বাঞ্ছনীয়। লক্ষণীয় যে কেবল গোপনাঙ্গ ঢেকে রাখাই যথেষ্ট নয়। অন্যের নিকট নিজের রান প্রদর্শন করাও অবৈধ। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

لاتكشف فخذك

অর্থাৎ : তোমার উরুদ্বয় কারো কাছে প্রকাশ করো না। (আবু দাউদ : ৪০১৫)

অন্য হাদীসে এসেছে,

اما علمت ان الفخذ عورة (ابوداود ٦٠١٤)

অর্থাৎ তুমি কি জানো না যে উরুদ্বয় সতরের অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ : ৪০১৪)

হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার আমি খুবই ভারী একটি পাথর নিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ আমার কাপড় খুলে পড়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة (ابوداود ٤٠١٥)

অর্থাৎ তোমার কাপড় উঠিয়ে নাও, বিবস্ত্র হয়ে চলাফেরা করো না। (আবু দাউদ : ৪০১৫)

এই বিধান জীবিত-মৃত সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। হাদীস শরীফে এসেছে,

لاتنظر الى فخذ حى ولا ميت

অর্থাৎ জীবিত বা মৃত কারো রানের দিকে তাকিও না। (আবু দাউদ : ৪০১৫)

অশ্লীলতার প্রকাশ কিয়ামতের আলামত

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে কিয়ামতের পূর্বক্ষণে নগ্নতা ও অশ্লীলতার ব্যাপক প্রচার ঘটবে। হাদীস শরীফে এসেছে,

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ :أَنْ يَظْهَرَ الشُّحُّ، وَالْفُحْشُ، وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ الْأَمِينُ، وَيَظْهَرُ ثِيَابٌ يَلْبَسُهَا نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، ويَعْلُو التُّحوتُ الْوُعُولَ (طبرانى اوسط ٧٤٨)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এসব কিয়ামতের আলামত যে একসময় কৃপণতা ও অশ্লীলতা প্রকাশ পাবে। খেয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে। আমানতদারকে খেয়ানতকারী মনে করা হবে। নারীদের নতুন নতুন পোশাকের উদ্ভব ঘটবে, যেগুলো পরিধান করে নারীরা বস্ত্রাবৃত হয়েও নগ্ন থাকবে। নিকৃষ্ট লোকেরা অভিজাত লোকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে। (তাবরানী আওসাত : ৭৪৮৯)

অন্য হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

অর্থাৎ নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, জাহান্নামীদের মধ্যে দুটি দলকে আমি দেখিনি। (কিয়ামতের আগে তাদের আবির্ভাব ঘটবে) এক দলের কাছে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, সেগুলো দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করতে থাকবে। আরেক দল হলো, এমন সব নারী, যারা কাপড় পরিহিত হবে, অথচ তারা প্রকৃত অর্থে নগ্ন থাকবে। তারা পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইবে, নিজেরাও পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের চুলের খোঁপা

উটের চুট ও কুঁজের মতো একদিকে হেলে থাকবে। তারা জান্নাতে যাবে না। জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ বহু দূর থেকে পাওয়া যাবে। (মুসলিম শরীফ : ৪/২১৯২)

এই হাদীসে كاسيات عاريات শব্দদ্বয়ের কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে। এক. এর অর্থ সেসব নারী আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্তা হবে, কিন্তু তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে বিরত থাকবে। দুই. তারা কাপড় পরিহিতা হবে, কিন্তু নেক আমল, পরকালের ফিকর ও আল্লাহর আনুগত্য থেকে নিজেদের দূরে রাখবে। তিন. সেসব নারী কাপড় পরিধান করেও সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য শরীরের কিছু অংশ খোলা রাখবে। ফলে তারা বস্ত্রাবৃত হয়েও নগ্ন থাকবে। চার. তারা বাহ্যিক সৌন্দর্য ও অলংকারে মোড়ানো থাকবে, কিন্তু তাকওয়ার পোশাক বা মানসিকতায় নগ্ন থাকবে। পাঁচ. তারা এতই পাতলা কাপড় পরিধান করবে যে দেহের অভ্যন্তরীণ অংশ দেখা যাবে। ফলে কাপড় পরিহিতা হয়েও তারা নগ্ন থাকবে। (শরহে নববী : ১৭/১৯০-১৯১) (মেরকাত : ৬/২৩০২)

শাড়ি পরিধানের বিধান :

আল্লামা ইউসুফ লুদয়ানভী (রহ.) লিখেছেন, যদি শাড়ি এভাবে পরিধান করা হয় যে, তাতে পুরো দেহ ঢেকে ফেলা হয়, তাহলে শাড়ি পরিধানে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আজকাল হাজারো নারীর মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন পুরো শরীর ঢেকে শাড়ি পরে থাকে। তাই শাড়ি পরে যেহেতু শরয়ী পর্দা রক্ষা করা যায় না। সুতরাং কেবল শাড়ি পরিধান করে নারীদের জন্য বাইরে বের হওয়া বৈধ নয়। (আপ কে মাসায়েল আওর উনকা হল ৮/৩৬৬)

পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় পরিধান করা নাজায়েয :

ইসলাম ধর্মে পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় পরিধান করা নাজায়েয। তবে নারীদের জন্য তা জায়েয। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 'আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম করা হয়েছে। তবে নারীদের জন্য তা হালাল।' (তিরমিযী শরীফ ১৭২০) কেন এগুলো নিষিদ্ধ করা হলো, অন্য হাদীসে এর ব্যাখ্যাও এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ

অর্থাৎ তোমরা রেশমি কাপড় পরিধান করো না এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করো না। কেননা দুনিয়ায় এসব কাপড় কাফেরদের ভোগের জন্য। আর পরকালে মুসলমানদের জন্য পুরস্কারস্বরূপ। (বুখারী-৫৪২৬)

অন্য কাপড়ের সঙ্গে রেশমি কাপড় সংযুক্ত করে ব্যবহার করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) দশটি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি নিষেধ করেছেন শরীর অংকিত করা থেকে, পশম উপড়ে ফেলা থেকে, বিবস্ত্র হয়ে এক পুরুষ অন্য পুরুষের সঙ্গে শয়ন করা থেকে এবং একজন নারী অন্য নারীর সঙ্গে বস্ত্রহীনা হয়ে নিদ্রা যাওয়া থেকে। তিনি আরো নিষেধ করেছেন অনারবিদের মতো কাপড়ের নিচে, কাঁধের নিচে রেশমি কাপড় পরিধান করা থেকে। তিনি আরো নিষেধ করেছেন ডাকাতি, লুটতরাজ করা থেকে। আর তিনি আংটি পরতেও নিষেধ করেছেন। তবে বিচারক বা রাষ্ট্রনায়কদের জন্য আংটি পরিধান করা বৈধ। (আবু দাউদ-৪০৪৯)

নাবালেগ ছেলে-সন্তানদের জন্যও এই বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ নাবালেগ বাচচাদের জন্যও রেশমি কাপড় পরিধান করা নাজায়েয। তবে অভিভাবক যদি তাদের এ ধরনের কাপড় পরিধান করায়, তবে এতে তারাই গোনাহগার হবে। (দুররুল মুখতার ৬/৩৬২, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ৫/৩৩১)

হাদীস শরীফে এসেছে–

عن جابر قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجوارى

অর্থ: হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর যুগে ছোট ছেলেদের দেহ থেকে রেশমি কাপড় খুলে ফেলতাম, কিন্তু মেয়েদের দেহে তা রেখে দিতাম। (আবু দাউদ-৪০৫৯)

একবার হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) তাঁর ছেলেকে নিয়ে হযরত উমর (রা.)-এর কাছে আসেন। ছেলেটির পরনে ছিল রেশমি কাপড়। উমর (রা.) সেই জামাটি টুকরো টুকরো করে ফেলেন। (ইবনে আবি শাইবা-২৪৬৫৭)

নারীদের জন্য রেশমি কাপড় পরিধান করা বৈধ :

ইসলামী শরীয়ত মতে নারীদের জন্য রেশমি কাপড় পরিধান করা বৈধ। কেননা নারীদের স্বভাব-ফিতরতের চাহিদা হলো, তারা সৌন্দর্য ও অলংকারের মাধ্যমে নিজেদের সাজিয়ে তুলতে পছন্দ করে। আর ইসলামও মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। তাই ইসলাম নারীদের জন্য রেশমি কাপড় ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে–

حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتى واحل لاناثهم (ترمذى ١٧٢٠)

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত,

إِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ :إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُورِ أُمَّتِي

অর্থ : মহানবী (সা.) এক হাতে রেশম অন্য হাতে স্বর্ণ নিয়ে বলেছেন, এই দুটি বস্তু আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। (নারীদের জন্য বৈধ)। (আবু দাউদ-৪০৫৭)

বিশেষ পরিস্থিতিতে পুরুষের জন্যও রেশমের ব্যবহার বৈধ :

একান্ত প্রয়োজনে বিশেষ পরিস্থিতির কারণে পুরুষের জন্যও রেশমি কাপড় পরিধান করা বৈধ। যেমন জিহাদের ময়দানে শত্রুর ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য বা শরীরে খুজলি-পাঁচড়া হলে রেশমি কাপড় পরিধান করা বৈধ। কেননা এতে শরীরে কিছুটা আরামবোধ হয়। নবী করীম (সা.) হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) ও হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-কে সফরকালে খুজলি-পাঁচড়ার কারণে রেশমি জামা পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন। (আবু দাউদ-৪০৫৬, তিরমিযী-১৭২২)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, যুদ্ধ ইত্যাদির জরুরতবশত খাঁটি রেশমি কাপড় পরিধান করা নাজায়েয। তবে রেশমমিশ্রিত কাপড় পরিধান করতে পারবে। কেননা জরুরত অল্প পরিমাণেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সাহেবাঈনের মতে, জরুরতবশত খাঁটি রেশমি কাপড় পরিধান করাও বৈধ। (দুররুল মুখতার ৬/৩৩৫৭)

তাছাড়া হাদীস শরীফে যেকোনো ব্যক্তির জন্য চার আঙুল পরিমাণ রেশম পরিধান করা জায়েয বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিমাণ প্রস্থের দিক থেকে। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে এর চেয়েও বেশি ব্যবহার করা জায়েয আছে। যেমন কাপড়ে রেশমের লম্বা তাগা বা সুতা লাগানো হলে এবং এর প্রস্থ চার আঙুল বা তার চেয়ে কম হলে এটি ব্যবহার করা জায়েয যদিও এর দৈর্ঘ্য অনেক লম্বা হয়। (দুররুল মুখতার ৬/৩৫১-৩৫২)

হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) রেশমি কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে দুই, তিন বা চার আঙুল পরিমাণ হলে তা জায়েয। (তিরমিযী-১৭২১) অন্য হাদীসে এসেছে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সা.) খাঁটি রেশমি কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে রেশমের কারুকাজ ও রেশমের তেনা ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই। (আবু দাউদ-৪০৫৫)

কাপড় ছাড়া অন্যান্য বস্তুতে রেশমের ব্যবহার :

যেভাবে রেশমের কাপড় পরিধান করা নাজায়েয। একইভাবে রেশমের চাদর, বিছানা, বালিশ, বেডশিট ইত্যাদি ব্যবহার করা নাজায়েয। আর এ নিষেধাজ্ঞা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য। যেভাবে নারীদের জন্য স্বর্ণ- রৌপ্যের ব্যবহার বৈধ, কিন্তু এগুলোর পাত্র ব্যবহার নারী-পুরুষ সবার জন্য অবৈধ। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সোনা-রুপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন এবং রেশমের কাপড় পরিধান করা ও তার ওপর বসা থেকে নিষেধ করেছেন। (বুখারী-৫৮৩৭)

হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের রেশমি গদির ওপর ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী-১৭৬০)

রেশমের কাপড় পরিধানের ওপর হুঁশিয়ারি :

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الاخرة (بخارى ٥٨٣٣)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমের কাপড় পরিধান করবে, সে আখেরাতে তা পরিধান করতে পারবে না। (বুখারী-৫৮৩৩)

অন্য হাদীসে এসেছে–

انما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এই রেশম ওই ব্যক্তি পরিধান করে, পরকালে যার কোনো অংশ নেই। (আবু দাউদ ৪০৪০)

من لبس ثوب حرير فى الدنيا البسه الله ثوب مذلة او ثوبا من نار (مسند احمد ٢٧٤٢٣)

অর্থ : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমি কাপড় পরিধান করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অপমানের পোশাক বা জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দেবেন। (মুসনাদে আহমদ-২৭৪২৩)

রেশম পরিধানকারীর জন্য পরকালের শাস্তির আগে দুনিয়াতেও কঠোর শাস্তির ঘোষণা এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ، وَالْحَرِيرَ وَذَكَرَ كَلَامًا، قَالَ:

يُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ : শেষ যামানায় আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি জাতি হবে, যারা রেশম ও রেশমি বস্তুকে হালাল করে নেবে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কেউ কেউ বানর ও শূকরে রূপান্তর হতে থাকবে। (আবু দাউদ-৪০৩৯)

রেশমি কাপড়ের বেচাকেনা বৈধ :

যেহেতু রেশমি কাপড় সত্তাগতভাবে নাপাক নয়, তাই এর ক্রয়-বিক্রয়, হাদিয়া দেওয়া, দান করা বৈধ। এর সপক্ষে মহানবী (সা.)-এর জীবনে অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যায়। একবার হযরত উমর (রা.) এক জোড়া রেশমি কাপড় মসজিদে নববীর দরজার সামনে বিক্রয় হতে দেখে বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি এটি ক্রয় করে নিতেন, তাহলে জুমু'আর দিন বা কোনো বিশেষ অতিথি এলে পরিধান করতে পারতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রেশমি কাপড় পরিধান করে, আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই। অতঃপর রাসূল (সা.)-এর কাছে এ ধরনের কয়েক জোড়া কাপড় হাদিয়াস্বরূপ আসে। তিনি উমর (রা.)-কে সেগুলো থেকে এক জোড়া হাদিয়া দেন। উমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের এটা হাদিয়া দিচ্ছেন, অথচ আপনিই এটা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এটা আমি তোমাকে পরিধান করতে দেইনি। তখন উমর (রা.) এটি মক্কায় তাঁর অমুসলিম ভাইকে পরিধান করতে দিয়েছেন। (আবু দাউদ-৪০৪০)

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এক জোড়া রেশমি কাপড় হাদিয়া আসে। তিনি সেটা আমাকে দিয়ে দেন। আমি তা পরিধান করে ফেললাম। এটা পরিধান করে যখন আমি তাঁর সামনে এলাম, তখন আমি তাঁর চেহারায় রাগান্বিত হওয়ার ছাপ দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমি এই কাপড় তোমাকে পরিধান করতে দেইনি, বরং এটা তোমার ঘরের মহিলাদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। (আবু দাউদ-৪০৪৩)

রেশমের রুমাল ব্যবহার :

তাসবিহের মধ্যে রেশমের ডোর ব্যবহার করা জায়েয। রেশমি রুমাল ব্যবহার করা নাজায়েয। (দুররুল মুখতার ৬/৩৬৩)

পুরুষের জন্য লাল পোশাক পরিধানের বিধান :

পুরুষের জন্য খাঁটি লাল রঙের কাপড় পরিধান করা মাকরূহে তানযিহী। তবে সেটা যদি পুরোপুরি লাল না হয়, বরং লাল ডোরা বা ফুলযুক্ত হয়, তাহলে সেটা ব্যবহার করা বৈধ। (দুররুল মুখতার ৬/৩৫৮)

একইভাবে হালকা লাল রঙের কিংবা কালছে লাল কাপড় পরিধান করা জায়েয। (তুহফাতুল আলমায়ী ৫/৫৮)

রাসূলুল্লাহ (সা.) লাল ডোরাযুক্ত কাপড় পরিধান করেছেন। হাদীস শরীফে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। (তিরমিযী-১৭২৪)

পুরুষের জন্য লাল রঙের পোশাক পরিধান করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

ان الشيطان يحب الحمرة فاياكم والحمرة وكل ثوب ذى شهرة (شعب الايمان ٥٧١٠)

অর্থাৎ শয়তান লাল রং পছন্দ করে। সুতরাং তোমরা লাল রং ও প্রদর্শনীমূলক পোশাক থেকে দূরে থাকবে। (শু'আবুল ঈমান-৫৯১৫)

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি হেঁটে যায়। তার পরনে ছিল দুটি লাল কাপড়। লোকটি মহানবী (সা.)-কে সালাম দিয়েছে, কিন্তু তিনি এর উত্তর দেননি। (আবু দাউদ-৪০৬৯)

লাল রঙের পোশাক নারীদের জন্য বৈধ :

নারীদের জন্য লাল রঙের পোশাক পরিধান করা বৈধ। হযরত আমর বিন শোয়াইব (রা.) তাঁর বাবা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে এক ঘাঁটিতে অবতরণ করলাম। আমার শরীরে একটি লাল রঙের মোটা চাদর ছিল। রাসূল (সা.) এটা দেখে বললেন, তোমার গায়ে এটা কী? তখন আমার মনে হলো, রাসূল (সা.) এটা অপছন্দ করেছেন। আমি ঘরে গিয়ে দেখলাম আমার স্ত্রী চুলোয় আগুন দিচ্ছে। আমি চাদরটি আগুনে নিক্ষেপ করলাম। পরদিন যথারীতি রাসূলের দরবারে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, চাদরটি কী করেছ? আমি বললাম, জ্বালিয়ে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি সেটা তোমার কোনো স্ত্রীকে দিয়ে দিতে পারতে। কেননা নারীরা লাল রঙের পোশাক পরিধান করলে কোনো অসুবিধা নেই। (আবু দাউদ-৪০৬৬)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা
শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর
অমূল্য বাণী

জায়গামতো মসনুন যিকির :
এক বড় আলেম প্রায় বিশ বছর থেকে বুখারী শরীফ পড়ান। তাঁর বাস ছিল কয়েক তলা ওপরে।
হাদীস শরীফে আছে,
كنا اذ صعدنا كبرنا واذ انزلنا سبحنا
'আমরা যখন ওপরে উঠতাম 'আল্লাহু আকবর' বলতাম। আর নিচে নামার সময় 'সুবহানাল্লাহ' পড়তাম।
উক্ত আলেমের এতদ সম্পর্কে কোনো খবরই ছিল না। কোনো সময় এই আমল করার সুযোগ হয়নি। এক স্থানে আমি বলতে ছিলাম ওপরে ওঠার সময় 'আল্লাহু আকবর', নিচে নামার সময় 'সুবহানাল্লাহ' এবং সমতল ভূমিতে চলার সময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সুন্নাত। তখন থেকে ওই আলেম এই আমলকে নিজের দৈনন্দিন আমল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাতে বোঝা যায়, বারবার সুন্নাতসমূহের কথা বলাবলি করা উচিত।

উস্তাদের প্রভাব ছাত্রের ওপর :
হযরত হারদূয়ী (রহ.) বলেন, আগেকার যুগে দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের উস্তাদগণ আহলে ইলম হওয়ার সাথে আহলে আমলও হতেন। অর্থাৎ ফরজ-ওয়াজিবের পাশাপাশি সুন্নাত ও মুস্তাহাব পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। গুরুত্ব সহকারে তাঁরা সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমলগুলো নিয়মিত পালন করতেন। যার কারণে এর প্রভাব ছাত্রদের ওপর পড়ত। তাদের মধ্যেও আমলের জযবা সৃষ্টি হতো।
এক শিক্ষিত লোক এলাহবাদে ইংরেজি টিচার ছিলেন। মাশাআল্লাহ খুব তাহাজ্জুদ গোজার ছিলেন। সে কারণে তাঁর সাগরিদগণও তাহাজ্জুদ আদায় করত। অর্থাৎ ইংরেজি পড়ছিলেন তথাপি তাহাজ্জুদ ছাড়তেন না। কিন্তু বর্তমানে মাদরাসায় শিক্ষানবিশদের মধ্যে এই আমল কম দেখা যায়। সবার কথা বলছি না। বেশির ভাগই এরূপ। যারা ইংরেজি তথা দুনিয়াবী ইলম অর্জন করছে তারা তাহাজ্জুদের পাবন্দ হবে, সুন্নাতের পাবন্দ হবে, মাদরাসার ছাত্রদের জন্য কি এটি জরুরি নয়? বিষয়টি খুবই চিন্তা করার মতো।

যেকোনো সমাবেশে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পূর্বে এর উপকারিতা ও ফজীলত বর্ণনা করা উচিত :
সাধারণত বিভিন্ন জলসা, সমাবেশ ও সম্মেলনে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা হয়। কিন্তু তা পড়ার উদ্দেশ্যই যেন বদলে গেছে। সে কারণে আমাদের মাদরাসায় এমন রীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, যখনই কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করা হয় তার আগে তেলাওয়াতে কোরআনের ফজীলত, উপকারিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়। এ বিষয়ে আমরা খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকি। যাতে কোরআন তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তেলাওয়াতের উপকারিতা সঠিকভাবে অর্জন করা যায়।

নামাযের মাধ্যমে অন্তরে নূর সৃষ্টি হয় :
হযরত হারদূয়ী (রহ.) বলেন, হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) আযানের আধাঘণ্টা আগে থেকে নামাযের প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করতেন। মসজিদে নামায পড়ার গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক এবং আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি। যাতে তাকবীরে উলার সাথে প্রথম কাতারে নামায আদায় করা যায়।
নামাযকে যত বেশি গুরুত্ব সহকারে সুন্নাত অনুযায়ী আদায় করা হবে, অন্তরে তত বেশি বিশেষ নূর সৃষ্টি হবে। অতঃপর এই নূরের বিভিন্ন প্রভাব হাত, পা এবং বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে। যার ফলে দেহের অঙ্গসমূহ গোনাহ থেকে বাঁচতে থাকবে। এরূপ নামাযই মূলত মানুষকে অশ্লীলতা ও পাপ-পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করে।

কোরআন-সুন্নাহর ভালোবাসার বিশেষ উপকারিতা :
পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর ভালোবাসা একটি বিশেষ জিনিস। এর মাধ্যমে ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ বৃদ্ধি পায়। অনেক ছাত্র আছে দাওরায়ে হাদীস পড়ে বা উচ্চশিক্ষা অর্জনে রত আছে; কিন্তু দেখবেন তাদের অনেকে খানার আদব আর সুন্নাত সম্পর্কে অবগত নয়। চিন্তা করেন এরা এসব কখন শিখবে। এখনই তাদেরকে ওসবের প্রতি ধাবিত করতে হবে। এর কারণ হলো সুন্নাতের প্রতি মুহাব্বত ও ভালোবাসার কমতি।

কিবির বা অহমিকা হলো আল্লাহর রাস্তার বড় ডাকাত :
কিবির, হাসদ, রিয়া এসবকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে হবে। বড় বড় অনেক মাশায়েখও এসব অদৃশ্য রোগে রোগী হয়ে থাকেন। তা অবশ্যই অস্বাভাবিক কিছু নয়। বড় বড় নামকরা ডাক্তার আর হাকীমও তো বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন। একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হাকীমের ঘটনা–রাতে ঘুমালেন সকালে আর ঘুম থেকে জাগার সুযোগ হয়নি। অথচ বাহ্যত তাঁর কোনো রোগ ছিল না। হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন এবং মৃত্যুবরণ করলেন। উলামায়ে কেরাম তো নফসকে ফানা করে দেওয়ার দাবি করে না। সুতরাং তাদের কথা ভিন্ন। কিন্তু মাশায়েখগণ ফানায়ে নফসের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও অনেকে অদৃশ্য রোগের শিকার। মনে রাখতে হবে, কিবির আল্লাহর রাস্তায় ডাকাতের মতো। তাই এর সঠিক চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

সুদের ভয়াবহতা : বাঁচার উপায়

ইসলামে রিবা ও সুদ হারাম এটা কোনো অস্পষ্ট বিষয় নয়। মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মুসলিম পরিবেশে লালিত-পালিত যেকোনো মুসলমান এ ব্যাপারে অবগত যে ইসলামে রিবা ও সুদ হারাম। শুধু তা-ই নয়, বিশ্বের চলমান বহু ধর্মগ্রন্থেও স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, সুদ হারাম ও মানবিকতার দুশমন। এটাও সর্বজনবিদিত যে সুদের রেওয়াজ নতুন কিছু নয় বরং ইসলামের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব থেকেই এর পথ চলা শুরু হয়েছে। ব্যক্তি জরুরতে যেমন সুদি লেনদেন ছিল, তদ্রূপ বাণিজ্যিক পর্যায়েও এর অস্তিত্ব লক্ষণীয়। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর ইউরোপিয়ান বেনিয়ারা যখন বিশ্বজুড়ে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে তখন নতুন যে জিনিসটির অস্তিত্ব দান করে তা হলো, মহাজনি প্রথা। সাথে ইহুদীদের সুদি কারবারকে নতুন নতুন রূপ ও নাম দিয়ে এত ব্যাপক আকারে সুদের প্রচলন ঘটাতে সক্ষম হয় যে, বর্তমানে সুদকে অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মেরুদণ্ড মনে করা হয়। আর এই জ্ঞানদানে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ব্যাংক নামক প্রতিষ্ঠান। যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ হলেও সুদ তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অদূরদর্শী কিছু লোককে এসব প্রতিষ্ঠান এই জ্ঞান দিতেও সক্ষম হয়েছে যে বর্তমান বিশ্বে কোনো ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক কোনো সেক্টর সুদবিহীন চলতে পারে না, পারবে না!! ব্যাপারটির এখানেই শেষ নয় বরং তাদের একটি দলকে দেখা যায়, যারা সর্ব ধর্ম মতে সুদের মতো মন্দ একটি জিনিসকে ভালো এবং জুলুমকে মানবিক ন্যায়সঙ্গত ও বিবেকসম্মত বলে চালিয়ে দিতে ব্যস্ত। কষ্ট হয় তখন, যখন এই দলটির তল্পিবাহী ও লেজুড়বৃত্তিতে মুসলিম নামধারী কোনো বুদ্ধিজীবীকে(?) মহা ব্যস্ত হতে দেখা যায়। এ নিমিত্তে তাদের অপব্যাখ্যা ও অপচেষ্টার কোনো প্রকার কমতি নেই। তাদের ব্যাপারে রাসূল (সা.) প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে গেছেন। ইরশাদ করেন,

والذى نفسى بيده ليبيتن ناس من امتى على اشر وبطر ولعب ولهو فيصبحون قردة وخناز يربا ستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر واكلهم الربا ولبسهم الحرير

ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! আমার উম্মতের কিছু লোক রাতেরবেলায় ঔদ্ধত্ত অহমিকা ও খেলাধুলায় মত্ত থাকবে ভোর হওয়ার আগেই তারা বানর ও শূকরের রূপ ধারণ করবে। কারণ তারা হারামকে হালাল বলবে, গায়িকা-নায়িকা নর্তকিকে মনেপ্রাণে পছন্দ করবে। মাদকদ্রব্য সেবন করবে, সুদ খাবে এবং রেশমের কাপড় পরিধান করবে। (মুসনাদে আহমদ হা. ২২৭৯০)

এসব রক্ত শোষাদের কাছে সুদ অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলেও দূরদর্শী এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের নিকট এটি এমন একটি ভয়াবহ ভাইরাস, যা অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে তিলে তিলে শেষ করেই ক্ষান্ত হবে। ভ্যাকসিনের মাধ্যমে এই ভাইরাসের প্রতিরোধ করা না হলে বিশ্ব অর্থনীতি তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে না। অনেক পশ্চিমা বিশেষজ্ঞও এই বাস্তবতাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

কোরআন-হাদীসে কুফর ও শিরকের পর সর্বাধিক ভীতি প্রদর্শন এবং শাস্তির কথা সুদের ব্যাপারেই উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি যারা সুদি লেনদেন পরিহার করবে না, তাদের কর্মকাণ্ডকে আল্লাহ এবং রাসূলের (সা.) সাথে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল বলা হয়েছে। ভেবে দেখুন! আল্লাহর সাথে যে যুদ্ধ ঘোষণা করবে তার পরিণতি কী হতে পারে? নিঃসন্দেহে ফেরাউন-নমরুদের মতো অথবা এর চেয়েও ভয়াবহ!

আল্লাহ তা'আলা মহাবিচারক, ন্যায়বিচারক, তিনি নিজের ওপর যেমন জুলুম করাকে হারাম করে

নিয়েছেন, তদ্রূপ বান্দাদের মাঝেও এটাকে হারাম করেছেন। তাই তো তাঁর শরীয়ত পরিপূর্ণ তাৎপর্য এবং বহুবিধ কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা পুরো মানবজাতির জন্য ইহকালীন ও পরকালীন সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি-উন্নতি এবং কল্যাণকেই বয়ে আনে। ক্ষুদ্র জ্ঞানের মানুষের কাছে এসব তাৎপর্য ও কল্যাণমূলক দিকগুলো প্রস্ফুটিত হোক বা না হোক। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, আল্লাহর যাবতীয় বিধান ন্যায়, করুণা ও তাৎপর্যনির্ভর। সূক্ষ্ম মেধার অধিকারী দূরদর্শীদের সামনে কিছু কিছু রহস্য উন্মোচিত হয়ে থাকে।

অতএব যেকোনো বিষয় বা সিদ্ধান্ত ন্যায়ের পরিবর্তে জুলুম-অন্যায়, দয়া ও করুণার বদলে শঠতা এবং মানবিকতার স্থলে অমানবিকতাকে প্রশ্রয় দেবে, তা কস্মিনকালেও আল্লাহর প্রদত্ত ইসলামী শরীয়ত হতে পারে না। যদিও কেউ অপব্যাখ্যা ও অপচেষ্টার মাধ্যমে তাকে শরীয়ত বলে চালিয়ে দিতে চায়।

আল্লাহ তা'আলা যেসব জুলুম হারাম করেছেন তার অন্যতম একটির নাম হল 'সুদ'। ইসলামী শরীয়তে যেমন সুদ হারাম করা হয়েছে তেমনি ইসলামপূর্ব অন্যান্য আসমানী শরীয়তেও এটাকে হারাম করা হয়েছে।

ইহুদী ধর্মে সুদ

ইহুদীদের জন্য সুদ হারাম হওয়ার বিষয়টি তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে এবং আল-কোরআনেও আলোচনা হয়েছে। তাদের ধর্মগ্রন্থ 'সিফরুল খুরুজ নং ২২ পৃ. ২৫"-তে উল্লেখ রয়েছে, "যদি তুমি গোত্রের কাউকে ঋণ প্রদান করো তবে তার সাথে সুদখোরের ন্যায় আচরণ করো না এবং তার ওপর সুদ চাপিয়ে দিও না।" (আররিবা ওয়াল মু'আমালাতুল মাসরাফিয়্যাহ ১৩) একই গ্রন্থের ৩৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, 'তোমার কোনো ভাই মুখাপেক্ষী হলে তাকে ঋণ দাও তার থেকে লাভ চেয়ো না।' (প্রাগুক্ত)

তাদের গ্রন্থ 'সিফরুত তাসনিয়াতে' উল্লেখ রয়েছে "তোমার ভাইকে সুদের শর্তে ঋণ দিও না। সুদ রুপার বাবদ হোক, খাদ্যের বাবদ হোক বা অন্য এমন কোনো জিনিসের বাবদ হোক, যা সুদের ওপর ঋণ দেওয়া হয়। (প্রাগুক্ত পৃ. ১৪)

ইহুদীদের সংবিধান 'তালমুদে' বলা হয়েছে, "সুদের ওপর ঋণদাতা খুনির সমতুল্য।"

আর 'মিছনাতে' বলা হয়েছে, "সুদখোরের সাক্ষ্য আদালতে অগ্রহণযোগ্য।" (মাওসু'আতুল ইকতিসাদিল ইসলামী ১২/২১৭)

বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রেরিত কয়েকজন নবীও সুদি লেনদেন করতে বারণ করেছেন। যেমন– হযরত দাউদ (আ.) বলেন, "তোমরা রুপা-চাঁদিকে সুদের ওপর দিও না।" হযরত সুলাইমান (আ.) বলেন, "সুদের মাধ্যমে সম্পদশালী হলে দরিদ্রদের ওপর কে দয়া করবে?" হযরত হিযকিয়াল (আ.) বলেন, "ভুখা-নাংগার রুটি ও কাপড়ের ব্যবস্থা করবে এবং সুদের ওপর ঋণ দেবে না।" (আররিবা ওয়াল মু'আমালাত পৃ. ১৪)

কিন্তু ইহুদীরা তাদের ধর্মীয় বিধানে পরিবর্তন সাধন করে এবং বিভিন্ন রকমের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে সুদি লেনদেনে জড়িয়ে যায়। কোরআনে তাদের অভিশপ্ত হওয়ার মূলে এটাকেও একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ করেন–

واخذهم الربو وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل

"আর তারা সুদ খেত, অথচ তাদেরকে তা খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং তারা মানুষের মাল-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করত। (সূরা নিসা-১৬১)

খ্রিস্টধর্মে সুদের বিধান :

সুদ ও ইন্টারেস্টের ব্যাপারে খ্রিস্টধর্মের অবস্থান তাওরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক ও অভিন্ন ছিল। খ্রিস্টান পূর্বপুরুষেরা সুদি লেনদেনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। খ্রিস্টধর্মের মৌলিক বহু বিষয়ে গির্জাগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন ধারার হলেও সুদি লেনদেন হারাম হওয়ার ব্যাপারে তাদের অবস্থান ছিল এক সুতায় গাঁথা। শায়খ আবু যাহরাহ (রহ.) বিষয়টির উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "যখন ঈসায়ীদের মধ্যে সংস্কারের যুগ আসে তখন সংস্কার আন্দোলনের লিডার মার্টিন লুথার শুধু ঋণের মাধ্যমে অর্জিত লাভ-ইন্টারেস্টকেই হারাম করেননি বরং সেসব ব্যবসায়িক লেনদেনকেও হারাম করেন, যা মানুষকে সুদের দিকে তাড়িয়ে নেবে বা এর মাধ্যমে কোনো ধরনের সুদের পথ উন্মোচিত হতে পারে। এমনকি

তিনি নগদের তুলনায় বাকিতে বেচাকেনার ক্ষেত্রে মূল্য বেশি নির্ধারণ করাকেও নিষিদ্ধ করেন। (তাহরীমুর রিবা পৃ. ১১)

যেসব ঈসায়ী মনীষীদের ব্যাপারে এ অভিযোগ রয়েছে যে তারা বিলাসিতা ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের ব্যাপারে সহনশীল ও নমনীয় ছিলেন, সুদের বিরুদ্ধে তাদের আওয়াজও ছিল সর্বব্যাপী। যেমন–নেকারার বলেন, 'যে ব্যক্তি বলবে সুদ অন্যায় নয় সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ।'

আর ইব্বন বলেন, 'সুদখোরেরা ইহজগতে তাদের মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। অতএব মৃত্যুর পর তারা কাফনেরও উপযুক্ত নয়। (আররিবা পৃ. ১৫)

১১৭৯ সনে ঈসায়ী আইনে উল্লেখ করা হয় 'সুদখোরেরা তাদের অন্যায়ের ওপর অবিচল থেকে মৃত্যুবরণ করলে ঈসায়ীদের কবরস্থানে তাদেরকে দাফন করা হবে না।' (মাওসুআতুল ইকতিসাদ ১২/২১৭)

ইঞ্জিলে লওকার ৩৪-৩৫ নং পৃষ্ঠাতে উল্লেখ রয়েছে, "যাদের থেকে বোনাস বা প্রতিদান পাওয়ার আশা করো তাদেরকে ঋণ দেওয়ার মধ্যে তোমাদের ফজীলতের কী আছে? তবে তোমরা অনুগ্রহ করতে থাকো এবং ঋণ প্রদান করো, অতিরিক্ত কোনো কিছু আশা করা ছাড়া। তবেই তোমরা উত্তম প্রতিদান পাবে। (আররিবা পৃ. ১৫)

দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সুদ :

সুদের ব্যাপারে বিশ্বখ্যাত দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি আসমানী ধর্মগুলোর থেকে ভিন্ন নয়। যেমন–অগস্টাইন বলেন, সুদখোরদের তুলনা তো অজগরের বংশধরের ন্যায়, যারা তাদের গর্ভধারিণীকে গিলে খায়। (মাওসুআতুল ইকতিসাদ ১২/২১৭)

প্লুটো বলেন, 'কোনো ব্যক্তির জন্য সুদি ঋণ দেওয়া বৈধ নয়।'

অ্যারিস্টটল বলেন, 'টাকা'–টাকা জন্ম দিতে পারে না। অর্থাৎ টাকাকে পণ্য হিসেবে গ্রহণ করে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে উপার্জন করা অনুচিত। কারণ টাকা হলো বস্তুর মাননির্ণয়ক। মাননির্ণয়ক জিনিস ব্যবসায়িক পণ্য হতে পারে না।

মি. ডায়মন্ড হোম বলেন, টাকা ব্যবসায়িক পণ্য নয়। বরং ব্যবসার মাধ্যম মাত্র। টাকা-পয়সা ব্যবসায়িক মেশিন নয়। তবে টাকা ব্যবসায়িক মেশিনের তেল বিশেষ, যা ওই মেশিনকে ঘোরায় এবং চালায়।

একজন ইংরেজ লেখক তাঁর কিতাবে লিখেন, সুদ হারাম হওয়ার প্রবক্তারা দলিল পেশ করেন যে স্বয়ং মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা কোনো উদ্দেশ্য নয়। বরং মুদ্রা তো জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় আসবাবের হাত বদল করার মাধ্যম মাত্র। ইউরোপীয় লেখকরা সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য বই-পুস্তক রচনা করেছেন। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন আমরা সুদের বিরুদ্ধে ওই আওয়াজ শুনতে পাব, যা মাদকদ্রব্য এবং শূকর খাওয়ার বিরুদ্ধে শুনতেছি। (সুদ কিয়া হায় ৫১-৫২, আররিবা ওয়াল মুআ'মালাত ১৭-১৮)

কোরআনে রিবা তথা সুদের বিধান :

সুদসংক্রান্ত বিধান পবিত্র কোরআনে চার ধাপে অবতীর্ণ হয়েছে।

আয়াত নং-১

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

"তোমরা যে সুদ দাও, যাতে তা মানুষের সম্পদে যুক্ত হয়ে বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না।"

সূরা রূমের ৩৯ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে হিজরতের পূর্বে মক্কায়। এটাই প্রথম আয়াত, যাতে রিবার নিন্দা করা হয়েছে। তখনো পর্যন্ত রিবা হারাম হয়নি এবং এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে রিবা হারাম হওয়া বোঝাও যায় না। তবে ভবিষ্যতে যে এটা হারাম হয়ে যেতে পারে–এ আয়াত তার একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বহন করে। বলা হয়েছে, রিবার আয় আল্লাহর কাছে বাড়ে না।

আয়াত নং-২

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

"মোটকথা, ইহুদীদের গুরুতর সীমালঙ্ঘনের কারণে আমি তাদের প্রতি এমন কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু হারাম করে দেই, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল। এবং এ কারণে যে তারা মানুষকে আল্লাহর পথে অত্যধিক বাধা প্রদান করত। এবং তারা সুদ খেত, অথচ তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং তারা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করত।"

সূরা নিসার ১৬০-১৬১ নং

আয়াতদ্বয়ের মধ্যে রিবা তথা সুদ খাওয়াকে ইহুদীদের মন্দ কাজের ফিরিস্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও মুসলমানদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো বিধান নেই। তবে ভবিষ্যতে হারাম হবে তা অনুমেয়।

আয়াত নং-৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো।" (সূরা আল ইমরান-১৩০)

উল্লিখিত আয়াতে মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্টভাবে রিবা ও সুদকে হারাম করা হয়েছে।

আয়াত নং-৪

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٨١)

(২৭৫) যারা সুদ খায় কিয়ামতের দিন তারা সেই ব্যক্তির মতো উঠবে, শয়তান যাকে স্পর্শ দ্বারা পাগল বানিয়ে দিয়েছে। এটা এ জন্য হবে যে, তারা বলেছিল, ব্যাবসাও তো সুদেরই মতো হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ ব্যাবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। সুতরাং যে ব্যক্তির নিকট তার রবের পক্ষ হতে উপদেশবাণী এসে গেছে সে যদি (সুদি কারবার হতে) নিবৃত্ত হয়। তবে অতীতে যা কিছু হয়েছে তা তারই। আর তার ব্যাপারে আল্লাহর এখতিয়ার। আর যে ব্যক্তি পুনরায় সে কাজই করবে, তো এরূপ ব্যক্তি জাহান্নামী হবে। তারা তাতেই সর্বদা থাকবে।

(২৭৬) আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-সদকাকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ এমন প্রতিটি লোককে অপছন্দ করেন যে অকৃতজ্ঞ, পাপিষ্ঠ।

(২৭৭) হ্যাঁ, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তারা তাদের রবের কাছে নিজেদের প্রতিদান লাভের উপযুক্ত হবে। তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা কোনো দুঃখও পাবে না।

(২৭৮) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাকো, তবে সুদের যে অংশই কারো কাছে অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও।

(২৭৯) তবুও যদি তোমরা এটা না করো তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর তোমরা যদি সুদ থেকে তাওবা করো, তবে তোমাদের মূল পুঁজি তোমাদের প্রাপ্য। তোমরা কারো প্রতি জুলুম করবে না তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।

(২৮০) এবং কোনো দেনাদার ব্যক্তি যদি অসচ্ছল হয়। তবে সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে। আর যদি সদকাই করে দাও, তবে তোমাদের জন্য সেটা অধিকতর শ্রেয়। যদি তোমরা উপলব্ধি করো।

(২৮১) এবং তোমরা সেই দিনের ভয় করো, যখন তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। অতঃপর পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে, যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। (সূরা বাকারা- ২৭৫-২৮১)

উল্লিখিত সাতটি আয়াতে বিস্তারিতভাবে রিবা ও সুদ হারাম হওয়ার বিধান এবং এর চরম পরিণতি ও ভয়াবহতার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

হাদীসে রিবা তথা সুদের বিধান :

সুদ হারাম হওয়া অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। প্রসিদ্ধ কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো–

১. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يارسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

ধ্বংসাত্মক সাতটি জিনিস থেকে তোমরা বেঁচে থাকো! সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওই সাতটি জিনিস কী? রাসূল (সা.) বলেন, সেগুলো হলো–১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা। ২. জাদু করা। ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। ৪. সুদ খাওয়া। ৫. এতিমের মাল আত্মসাৎ করা। ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ভেগে যাওয়া। ৭. সতী-সাধ্বী অবলা মুসলিম নারীদের ওপর অপবাদ আরোপ করা। (বুখারী, মুসলিম)

৯. ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبة امره الى قلة

যে ব্যক্তি সুদের মাধ্যমে মাল বৃদ্ধি করবে, ঘাটতিই তার শেষ পরিণতি হবে। (ইবনে মাজাহ, হাকিম)

শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী ভাইয়েরা সুদকে 'না' বলুন :

পুরো অর্থব্যবস্থাকে সুদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের ভূমিকাকেও খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্র যদি সুদিব্যবস্থার মূলোৎপাটন না করে, তবে জনগণের জন্য যে- যে স্তরেরই হোক, সুদি লেনদেন কস্মিনকালেও

لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء

রাসূল (সা.) চার শ্রেণীর লোকের ওপর অভিশম্পাত করেছেন। তারা হলো–সুদখোর, সুদদাতা, সুদি হিসাবরক্ষক ও সুদের সাক্ষী। (বুখারী ও মুসলিম)

২. ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك

সত্তরের চেয়ে বেশি সুদের খারাপ ও ক্ষতিকর দিক রয়েছে। তার সমপরিমাণ শিরকেরও ক্ষতিকর দিক রয়েছে। (ইবনে মাজাহ, মুনাদে বায্যার)

৩. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন–

الربا ثلاث وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه

'সুদের মধ্যে ৭৩টি মন্দ দিক রয়েছে, সর্বনিম্নটি হলো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারের সমতুল্য। (হাকেম)

৪. আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم عند الله من ثلاثة وثلاثين زينة يزينها فى الاسلام

'সুদি পন্থায় এক দেরহাম আয় করা আল্লাহর নিকট মুসলমান হয়েও ৩৩ (তেত্রিশ) বার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে মারাত্মক জঘন্য। (তাবারানী)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, জেনে-বুঝে সুদি পন্থায় এক দেরহাম উপার্জন করা ৩৬ (ছত্রিশ) বার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও বেশি জঘন্য। (আহমদ, তাবারানী)

৫. ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন–

بين يدى الساعة يظهر الربا والزنا والخمر

কিয়ামতের পূর্বে সুদ, ব্যভিচার ও মাদকের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। (তাবারানী)

৬. আমর বিন আস (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি–

مامن قوم يظهر فيهم الربا الا اخذوا بالسنة ومن من قوم يظهر فيهم الرشاء الا اخذوا بالرعب

যে জাতির মধ্যে সুদের বিস্তার ঘটবে তারা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে, আর যে জাতির মধ্যে ঘুষের লেনদেন ব্যাপকতা লাভ করবে, তারা ভিতু ও আতঙ্কগ্রস্ত হবে। (আহমদ)

৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন–

نهى رسول الله ﷺ ان تشترى الثمرة حتى تطعم وقال : اذا ظهر الزنا والربا فى قرية فقداحلوا بانفسهم عذاب الله

রাসূল (সা.) গাছের ফল খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার আগেই ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, যখন কোনো অঞ্চলে ব্যভিচার ও সুদ বিস্তার লাভ করবে, বুঝতে হবে সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের ওপর আল্লাহর আজাব-গজবকে অবধারিত করে নিয়েছে। (হাকিম)

৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا

বৈধ হবে না। বরং জনগণের দায়িত্ব হবে প্রত্যেকে যার যার অবস্থানে সুদের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তোলা এবং প্রত্যেকে নিজের মালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত লেনদেন সুদমুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। ব্যক্তিগত পর্যায়ে সুদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সাম্ভাব্য কিছু পথ-পদ্ধতি ও করণীয় নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. কৃত সুদি লেনদেন ও চুক্তিপত্র ততক্ষণাৎ বাতিল করে সাচ্চা মনে তাওবা করা। অতীতে যাদের থেকে সুদ গ্রহণ করা হয়েছে তাদেরকে সে অর্থ ফেরত দেওয়া। ফেরত দেওয়া সম্ভব না হলে সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া তা সদকা করে দেওয়া। এবং বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সাথে আলোচনা করে বিকল্প শরীয়াহ পদ্ধতি জেনে নিয়ে সেই মোতাবেক নিজের ব্যাবসা বানিজ্য পরিচালনা করা।

২. সুদি ব্যাংকের সেভিংস স্কিম ও ফিক্সড ডিপোজিট ইত্যাদি থেকে টাকা উত্তোলন করে লাভজনক কোনো কাজে লাগানো। যেমন– জমি, বাসা, ফ্ল্যাট ইত্যাদি ক্রয় করে ভাড়া প্রদান করা। এ ক্ষেত্রে কিছু ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে সন্দেহ নেই। তবে সুদখোর হাশরের মাঠে যে ভয়াবহ কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে সে তুলনায় এই ঝামেলা কোনো ঝামেলাই নয়।

৩. যদি কেউ নিজে ব্যবসা-বাণিজ্যের ঝামেলায় জড়াতে না চায়, আবার অলস টাকা ঘরে ফেলে রাখতেও মন সায় না দেয়, তবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কোনো সুদবিহীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শিরকত ও মুদারাবার ভিত্তিতে টাকা ইনভেস্ট করে মুনাফা অর্জন করা যেতে পারে।

৪. সুদি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ক্লোজড করে সুদবিহীন ব্যাংকে হিসাব খোলা। উল্লেখ্য সুদবিহীন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা সঠিক নাকি ভুল এর পেছনে না পড়ে এটা দেখতে হবে যে সুদবিহীন ব্যাংকের লেনদেনের বাস্তব চিত্র সুদি ব্যাংকের থেকে ভিন্ন এবং তার নীতিমালা অভিজ্ঞ মুফতীদের দ্বারা প্রণীত কি না?

৫. ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হলে অথবা বাকিতে বাড়ি-গাড়ি কেনার প্রয়োজন দেখা দিলে সুদি ব্যাংক থেকে লোন না নিয়ে সুদবিহীন ব্যাংকের সাথে মুরাবাহা, ইজারা বা অন্য কোনো শরীয়া পদ্ধতিতে লেনদেন করা।

৬. কোম্পানির প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ফান্ড এবং অন্যান্য আর্থিক যত ফান্ড আছে, সেগুলো সুদি ব্যাংক থেকে প্রত্যাহার করে, সুদবিহীন ব্যাংকে স্থানান্তরিত করা।

৭. সুদি প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবীরা বিকল্প বৈধ ও হালাল চাকরির সন্ধান করতে থাকবে। হালাল চাকরি পাওয়ার সাথে সাথে সুদি প্রতিষ্ঠানের চাকরি ছেড়ে দেবে।

৮. ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার না করে ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা। যদি নিরুপায় হয়ে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতেই হয় তাহলে Interest free সময়ের মধ্যেই অর্থ জমা করে দেবে। যেন সুদ দিতে না হয়।

৯. প্রাইজ বন্ড এবং অন্যান্য যেকোনো ধরনের বন্ডের ক্রয়-বিক্রয় থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকবে। যদি প্রাইজ বন্ডের পুরস্কার বাবদ কিছু অর্থ অর্জন হয় বা বন্ডের বিক্রয়মূল্যে মুনাফা অর্জিত হয়, তাহলে পুরস্কার ও মুনাফা উভয়টি সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সদকা করে দিতে হবে। সাথে সাথে ফেসভ্যালুর ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে প্রাইজ বন্ড রিটার্ন করে নিজেকে মুক্ত করে নেবে।

১০. জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের মাঝে প্রচলিত টোকেন যেগুলোর মধ্যে জুয়া, কেমার, সুদ ও গররের (ধোঁকার) উপাদান পাওয়া যায়। এগুলো থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকবে।

১১. শুধু এমন সব কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের অনুমতি আছে, যেসব কোম্পানির মূল কার্যক্রম শরীয়তসম্মত এবং উৎপাদন ও হালাল। আরো লক্ষণীয় বিষয় হলো, কোম্পানির বার্ষিক ব্যালেন্সশিটে মুনাফার মধ্যে সুদের হার নির্ণয় করে, মুনাফা (Dividend) থেকে ওই হারে কিছু অর্থ সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সদকা করে দিতে হবে।

১২. নিজের দোকান, কারবার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় একজন নির্ভরযোগ্য বিচক্ষণ ও দক্ষ মুফতীর পরামর্শ ও দিকনির্দেশনাকে বাধ্যতামূলক বিষয় মনে করতে হবে। বিশেষ করে যেকোনো নতুন কারবার শুরু করার আগে অবশ্যই খোদাভীরু অভিজ্ঞ মুফতী বা কোনো ফাতাওয়া বিভাগ থেকে সে বিষয়ে জেনে নিতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা সবাইকে সুদমুক্ত হালাল উপার্জনের তাওফিক দান করুন। আমীন

দ্বীনের দাঈ ও খাদেমদের পরস্পর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

দ্বীন ইসলাম সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, মুসলমানদের অন্তরে ভালো কাজের আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার মনোভাব সৃষ্টির জন্য যে চেষ্টা প্রচেষ্টা চলছে, চাই তা যেকোনো সহীহ পদ্ধতিতেই হোক না কেন এগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা যেমন সন্দেহাতীত, তেমনি সেগুলোর গুরুত্ব ও সর্বজনস্বীকৃত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে তাদের প্রত্যেকের যে শুধু নিয়্যাত ও কর্মপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন তা-ই নয় বরং চিন্তাধারা, কর্মকৌশল, নিয়ম-কানুন ইত্যাদির বিচারেও একে অন্য থেকে পৃথক। এমতাবস্থায় দ্বীনি মারকাজ ও মাহফিল, আন্দোলন ও সংগঠন এবং মাদরাসাসমূহ ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক; সর্বোপরি দ্বীনের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত দাঈদের পারস্পরিক আচরণ ও উচ্চারণ কেমন হওয়া উচিত, তা জেনে নেওয়া দরকার।

আমাদের অবস্থান :

দ্বীন ইসলাম হলো একটি দুর্গ, শান্তি-সুখের রাজপ্রাসাদ। যে ব্যক্তি এর মধ্যে প্রবেশ করবে সে ঝড়-তুফান, ঘূর্ণিবায়ু এবং অগ্নিঝড়ের চেয়ে মারাত্মক বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতের চির সুখ-শান্তি আর নিরাপত্তার অধিকারী হবে। সুতরাং সাধারণ দুর্গ বা রাজপ্রাসাদ যেমন কারো একক প্রচেষ্টায় অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। বরং ইঞ্জিনিয়ার, রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, জোগালিসহ সকল কর্মচারীর যৌথ প্রচেষ্টা জরুরি। তদ্রূপ দ্বীনের এ দুর্গ বা রাজপ্রাসাদও শুধু যে কোনো একটি দলের প্রচেষ্টা বা মেহনতে পরিপূর্ণভাবে ওজুদে আসতে পারে না। বরং তার জন্য জরুরি হলো দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত সব দলের যৌথ তৎপরতা ও প্রচেষ্টা।

তা'লীম, তাবলীগ ও তাযকিয়া মৌলিক বিষয়

এ বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়াতে আগমনের মৌলিক যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে এর মধ্যে তা'লীম, তাবলীগ ও তাযকিয়া সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : (তরজমা) "তিনিই উম্মিদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাঁদের অন্তরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কোরআন ও সুন্নাহ।" (সূরা জুমু'আ, আয়াত নং-২)

উক্ত কাজগুলোর কোনো একটির ব্যাপারেও নির্দিষ্ট করে এ কথা বলা যাবে না যে মূল হচ্ছে এ কাজ; আর অন্যগুলো গৌণ; মর্যাদা ও গুরুত্বের বিচারে এটি অগ্রগণ্য আর বাকিগুলো তেমন নয়।

শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ও তার মর্যাদা

মুহিউস্‌সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব (রহ.) এ কথাটি বড় সুন্দর করে বলেছেন। তিনি বলেন : 'অভিন্ন জাত ও অভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর মধ্যেই শুধু তুলনা চলে। পরস্পর বিপরীত দুই বস্তুর মধ্যে তা হয় না। সুতরাং কেউ যদি প্রশ্ন করে চোখ বেশি জরুরি নাকি কান বেশি জরুরি? তাহলে বলা হবে স্ব-স্ব স্থানে উভয়টিই জরুরি। এ ক্ষেত্রে তুলনা করাই ভুল। তবে এটা বলা যেতে পারে যে উভয় চোখের মধ্যে যে চোখে ভালো দেখা যায় সে চোখ বেশি ভালো। আর উভয় কানের মধ্যে যে কানে ভালো শোনা যায় সে কান বেশি ভালো।

উপরোক্ত উদাহরণের আলোকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে কেউ যদি প্রশ্ন করে "তা'লীম তাযকিয়া ও তাবলীগের মধ্যে কোনটা বেশি জরুরি?" তাহলে তার এই প্রশ্ন ঠিক হবে না। কেননা এগুলো প্রতিটি পৃথক পৃথক বিষয়। আর ভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর মধ্যে তুলনা চলে না। সুতরাং উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ই জরুরি। অর্থাৎ, স্ব-স্ব স্থানে তা'লীম যেমন জরুরি, তেমনি তাবলীগও জরুরি। অনুরূপভাবে তাযকিয়াও জরুরি। বরং তাবলীগ ও তা'লীম কবুল হওয়ার জন্য তাযকিয়া অপরিহার্য। (মাজালিসে আবরার : ২৯৪)

শাখাত্রয়ে পরস্পর সম্পর্ক এবং তার উপকারিতা

মুহিউস্‌সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব (রহ.)-এর একটি কথা খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন : 'মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ পৃথক পৃথক কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ নিজের শরীরের কোনো অঙ্গকে তুচ্ছ মনে করে না। অঙ্গসমূহের পৃথক পৃথক কাজের কোনো তুলনাও করে না। এমনকি এক অঙ্গকে অপর অঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে না। এমনিভাবে দ্বীন ইসলামও একটি দেহসদৃশ। তার বিভিন্ন অংশ আছে। কেউ মাদরাসায় তা'লীম তারবিয়াতের কাজ করছে, কেউ তাবলীগ করছে, আবার কেউ খানকাতে তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কাজ করছে। এমতাবস্থায় দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা একে-অন্যকে তুচ্ছ বা হেয় জ্ঞান করে কিভাবে? তাছাড়া পরস্পরের কাজের তুলনা করা বা একে-অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বীই বা মনে করার সুযোগ কোথায়! এ কারণেই দেখা যায় যে পূর্ববর্তী আউলিয়ায়ে কেরাম দ্বীনের সব ধরনের খাদেমদের ইকরাম ও তা'যীম তথা শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (المائدة : ٢)

অর্থাৎ, ভালো কাজে পরস্পর সহযোগিতা করার নির্দেশ দিতেন। সুতরাং একে-অন্যকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করবে। 'আমাদের' ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে; 'আমাদের' মাদরাসা চলছে, 'আমাদের' দল আগে বাড়ুক; এসব কী ধরনের কথা! দ্বীনকে সামনে রাখুন। নিজেকে পেশ করবেন না। কারোর বয়ান দ্বারা যদি সমাজের ব্যাপক উপকার হয় বা কোনো মাদরাসা দ্বারা যদি দ্বীনের উপকার হয় তাহলে হিংসা বা আত্মপীড়নের কী আছে?' (মাজালিসে আবরার, পৃ: ৮৪)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের শক্তিশালী মুখপাত্র ও নির্ভীক সৈনিক আল্লামা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী (রহ.) বলেন : 'এ কাজ (দাওয়াত ও তাবলীগ) ছাড়াও দ্বীনের আরো অনেক কাজ ও শাখা আছে। যেমন–মক্তব, মাদরাসা ও দ্বীনি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। অন্তর থেকেই সেগুলোকে সম্মান ও মূল্যায়ন করা চাই এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য আমাদের অন্তরে হামদর্দী ও সহানুভূতি থাকা উচিত। আল্লাহ তা'আলার যেসব বান্দা ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের সাথে এসব বিষয়ে নিজেদের শ্রম ও কোরবানী পেশ করে যাচ্ছেন, সেসব বান্দাকে যথাযথ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ না করুন! আমাদের কাজকেই যদি দ্বীনের একমাত্র কাজ মনে করি আর দ্বীনের অন্যান্য কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সৃষ্টি হয় তাহলে এটা হবে আমাদের গোমরাহী ও বদনসিবী। বরং দ্বীনের দাবিতে বদদ্বীনি হবে। নিজেরদেকে বিশেষ করে হক্কানী-রব্বানী উলামায়ে কেরাম ও আহলুল্লাহদের খাদেম ও অনুগত ভৃত্য মনে করবে। তাদের থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য সময়ে সময়ে তাদের খেদমতে হাজির হবে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখাকে নিজের জন্য আবশ্যকীয় প্রয়োজন মনে করবে।' (আল ফুরকান, পৃ. ৭, ভলিয়ম-১৯)

ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) বলেন : 'আমাদের এই আন্দোলনের (দাওয়াত ও তাবলীগ) সমসাময়িক অন্যান্য আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানগুলো যদি 'বাণীনির্ভর' বিষয়গুলোকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে ইখলাসের সাথে কাজ করে তাহলে আমাদের উচিত তাদের সাথে ইখতিলাফ না করা। বরং তাদের কাজকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করা ও স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। সাথে সাথে তাদের জন্য দু'আ করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখা।' (মাসিক আল ফুরকান : পৃ. ৩-৫, ভলিয়ম : ২০)

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ত্বকী উসমানী (দা. বা.) বলেন : 'উম্মতে মুসলিমাকে আজ চতুর্মুখী ফিতনা ঘিরে রেখেছে। ফিতনার যেন ঝড়-তুফান চলছে। কিংবা মুষলধারে বর্ষণ চলছে। এই চতুর্মুখী ঝড়-তুফানের মোকাবিলা করা কোনো এক জামা'আতের পক্ষে সম্ভব নয়। একেকটি জামা'আতকে এখন একেকটি ফিতনার মোকাবিলায় শক্তভাবে দাঁড়ানো উচিত। এবং জান, মাল, চিন্তা-ভাবনা ও শক্তি-সাধনা সেই কাজেই পূর্ণভাবে নিয়োজিত করা উচিত। কাজের পথ ও পন্থা ভিন্ন হতে পারে এবং ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। তবে অন্যান্য দ্বীনি মেহনতের প্রতিও হামদর্দী ও সহানুভূতি থাকতে হবে। কিন্তু প্রত্যেক জামা'আত যদি আচরণে ও উচ্চারণে এ কথা বোঝায় যে এটাই একমাত্র কাজ এবং একমাত্র কর্মপন্থা;

সুতরাং এটাই সবার করা উচিত তাহলে এটা হবে গুরুতর ভুল। কেননা আসল উদ্দেশ্য দ্বীনের খেদমত। আর কোন মানুষ যদি ইখলাসের সাথে দ্বীনের কোনো খেদমতে নিয়োজিত থাকে তাহলে তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা উচিত নয়। বরং দু'আ ও সাধ্যমতো তাকে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু উদার মানসিকতা ও সহমর্মিতা আমাদের মাঝে এখন একেবারেই অনুপস্থিত। এটা অনেক রকম সমস্যা সৃষ্টি করে এবং দ্বীনের বড় ধরনের ক্ষতি করে। এতে উম্মতের বিভিন্ন তবকার মাঝে অযথা ব্যবধান ও দূরত্ব সৃষ্টি করে। (১৪২১ হিজরীতে ঢাকার বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে তিনি এ বয়ানটি করেছিলেন।)

বর্তমান পরিস্থিতি

আল্লামা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী (রহ.) বলেন : 'দ্বীনের অপরাপর আন্দোলনের ও প্রতিষ্ঠানের খেদমত ও অবদান স্বীকার না করা, সেগুলোকে যথার্থ মূল্যায়ন না করা এবং সামান্য ইখতেলাফ ও মতানৈক্যের কারণে সমালোচনামুখর হওয়া যামানার এক মহামারি ব্যাধি হয়ে দেখা দিয়েছে। আর শয়তানও এ কাজে বিরাট সফলতা পেয়ে গেছে। বিভিন্ন দল ও সংগঠনের এ রকম মনোভাব সৃষ্টি করে উম্মতের দায়িত্বশীল লোকদের শতধা বিভক্ত করে দিয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই একে-অন্যের দোষ চর্চায় মেতে উঠেছে। কিন্তু তার গুণ ও অবদানের কোনো আলোচনাই নেই। (মাসিক আল ফুরকান, পৃ. ৩, ৪ ও ৫, ভলিয়ম : ২০)

আজ বাতিল যেখানে বিভিন্ন আকৃতি ও অবয়বে যে শুধু আত্মপ্রকাশ করছে তা-ই নয় বরং সমস্ত কুফরি শক্তি এক প্লাটফর্মে জমা হয়ে ইসলামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কোরআনের ভাষায় :-

وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (الأنبياء: ٩٦)

অর্থাৎ, 'প্রত্যেক উঁচু ভূমি হতে তারা দ্রুত ছুটে আসছে।' এমন নাজুকতম পরিস্থিতিতে আহলে হক্বের ঝাণ্ডাবাহী কর্মীদের এ অবস্থা বিদ্যমান থাকা খুবই পরিতাপের বিষয়। উচিত ছিল আপসে মুহব্বত ও ভালোবাসার আবহ গড়ে তোলা; যাতে পরস্পর সম্পর্ক ভালো থাকে।

পরিস্থিতির দাবি

এ নাজুক পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেরই উচিত সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী পছন্দমতো যেকোনো দ্বীনি কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা। যিনি যে শাখাতেই কাজ করুন না কেন তিনি মূলত দ্বীনেরই কাজ করছেন। দ্বীনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা একে-অন্যের সহকর্মী ও সহযোগী।

দুঃখ-দুর্দশায় শরিক হওয়া সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করা চাই। সর্বোপরি একে-অন্যের খেদমতসমূহের প্রশংসা করা এবং তার কাজের তারাক্কি ও অগ্রগামিতায় আনন্দ প্রকাশ করা। এ জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা।

১. ইহতিমামের সাথে একে-অন্যের জন্য দু'আ করা। এবং পরস্পর একে-অন্যের নিকট দু'আর দরখাস্ত করা। এতে লাভ এই হবে যে প্রত্যেকেই অন্যকে নিজের জন্য দু'আ করণেওয়ালা মনে করবে। এভাবেই পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। কারো কোনো ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পেলে আপসে বা বৈঠকে আলোচনা-সমালোচনা না করা বরং হামদর্দী ও সহানুভূতির সাথে তা সংশোধনের চেষ্টা করা। অথবা যাদের দ্বারা এর সংশোধন সম্ভব তাদেরকে অবহিত করা।

২. সময়-সুযোগ মতো পরস্পর মিলিত হয়ে একে-অন্যের কাজের খোঁজ নেওয়া। কাজের তারাক্কি ও অগ্রগামিতায় আনন্দ প্রকাশ করা। কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য করা এবং সুপরামর্শ দেওয়া।

৩. নিজের মহল্লার ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা। যেখানে যে কাজের প্রয়োজন দেখা দেয়, সে কাজের যোগ্য লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এবং নিজের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সাহায্য করা।

৪. নিজেদের কাজের পরিচিতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করা এবং তাতে অংশগ্রহণের জন্য এমনভাবে উৎসাহ দেওয়া, যাতে দ্বীনের অন্যান্য কাজের সাথে তুলনাও না হয়, আবার তুচ্ছজ্ঞান করাও না হয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দেবে, যেন উদার মনোভাবের পরিচয় ফুটে ওঠে। (সূত্র : মাওলানা ইফজালুর রহমান কর্তৃক রচিত 'বা-হামী রবত কেয়ছা হো?')

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ কথাগুলোর ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শরীয়তের দৃষ্টিতে
চেহারার পর্দা

মুফতি শরীফুল আজম

পর্দার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য :

হযরত আদম (আ.) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের শরীয়তে বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা ও অশ্লিলতা হারাম ছিল। এ ক্ষেত্রে আমাদের নবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শরীয়তের বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে বেহায়াপনার মাধ্যম বা উপায়-উপকরণসমূহকেও হারাম করা হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা কেয়ামত অবধি এই শরীয়তকে হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং এর সাচ্চা অনুসারী হিসেবে একদল লোককে সর্বদা বাকি রাখবেন তাই প্রয়োজন হয়েছে তাদের পূত-পবিত্র রাখার বিধান জারি করা। বিগত উম্মতের আচরণ থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে বেহায়াপনার মাধ্যম বা উপকরণ নিষিদ্ধ করা ছাড়া কোনো জাতিকে বেহায়াপনা থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। বেহায়াপনা এবং এর সকল আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ড এমন ভয়ানক অপরাধ, যার প্রভাবে শুধু ব্যক্তি বা পরিবারই নয় বরং দেশ ও জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমান বিশ্বে যত খুন-খারাবির ঘটনা ঘটছে এর সিংহভাগ নারীঘটিত বা রিপুতাড়িত। তাই সকল যুগে সকল সভ্যতায় বেহায়াপনা মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। আধুনিক ইউরোপ-আমেরিকা নিজেদের ধর্মীয় রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে বেহায়াপনা ও যেনা-ব্যাভিচারকে সামাজিকভাবে বৈধতা দিলেও এর অবসম্ভাবী ভয়াবহ পরিণতিকে অপরাধের গণ্ডি থেকে মুক্ত ঘোষণা করতে পারেনি। তাই তো নারীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, ইভ টিজিং ইত্যাদিকে অপরাধ গণ্য করতে হয়েছে। এর উদাহরণ ওই ব্যক্তির মতো যে কিনা শুষ্ক লাকড়ি স্তূপ করে তাতে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিল। অতঃপর আগুনের লেলিহান দাউ দাউ করে উঠলে এর স্ফুলিঙ্গের ওপর পাবন্দি লাগানোর চিন্তা করল। এর বিপরীত ইসলাম যে সকল কাজকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে তার ভূমিকাসমূহে পাবন্দি লাগিয়ে দিয়েছে এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেনা-ব্যাভিচার বন্ধ করা কিন্তু শুরু করা হয়েছে দৃষ্টি অবনত রাখার বিধান দিয়ে। নর-নারীর অবাধে চলাফেরা নিষেধ করা হয়েছে। নারীদের গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে বের হতে হলে আপাদমস্তক বোরকা বা লম্বা চাদর দিয়ে ঢেকে নিতে বলা হয়েছে। ভিড় এড়িয়ে রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলতে বলা হয়েছে। সুগন্ধি বা বাজনা-জাতীয় অলঙ্কার ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মোটকথা, পর্দার বিধানের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিম জাতিকে ব্যাভিচার থেকে রক্ষা করা। পরনারীর প্রতি কুদৃষ্টি চোখের যেনা, তার কথা শোনা কানের যেনা, তাকে স্পর্শ করা হাতের যেনা আর তার দিকে হেঁটে যাওয়া পায়ের যেনা বলে হাদীসে ঘোষণা করা হয়েছে। (মুসলিম) অতএব সকল প্রকার যেনা-ব্যাভিচার বন্ধে দেওয়া হয়েছে পর্দার বিধান।

প্রেক্ষাপট :

হুজুর (সা.)-এর যুগে দুষ্ট প্রকৃতির মোনাফেকরা পথেঘাটে নারীদের উত্ত্যক্ত করত। তাদের আচরণে মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। অনেক সময় এরা নবীজি (সা.)-এর মজলিসেও উপস্থিত হতো। হযরত উমর (রা.) ঈমানী আত্মমর্যাদার প্রতি একটু বেশি সচেতন ছিলেন। অসভ্য লোকদের আনাগোনা তাকে পীড়া দিত। তিনি একদা রাসূল (সা.)-এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে সৎ-অসৎ হরেক রকমের লোক আসা-যাওয়া করে আপনি পত্নীগণকে পর্দা করার আদেশ দিলে খুবই ভালো হতো। (বুখারী)

হযরত উমর (রা.) চাইতেন উম্মুল মুমিনীনগণ যেন কোনো পরপুরুষের নজরে না পড়ে। একবার উম্মুল মুমিনীন হযরত সাউদা (রা.) রাতের আঁধারে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গৃহের বাইরে গেলেন। তিনি ছিলেন স্থূলদেহী, পরিচিতরা দেখেই চিনে ফেলত। হযরত উমর (রা.) তাঁকে দেখে বললেন, হে সাউদা! আপনাকে চিনে ফেলেছি। আপনি তো আমাদের দৃষ্টির আড়াল হতে পারছেন না। এবার ভেবে দেখুন কিভাবে ঘর থেকে বের হবেন। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত উমর (রা.) চাচ্ছিলেন নারী

দেহের অবয়বের পর্দা। তাদের দেহের গড়নও যেন পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে নিরাপদ থাকে। দেহের গড়ন দেখে পরিচয় জানা সম্ভব হলে দুষ্ট লোকের টার্গেটে পরিণত হতে পারে। অতএব পরবর্তীতে যখন পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয় তাতে এ বিষয়টি লক্ষ করা যায়। পর্দার মাঝে দেহাবয়বের পর্দার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সূচনার ইতিহাস

বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার বিধান অতীব জরুরি হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় পঞ্চম হিজরীতে সর্বপ্রথম পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয় উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহশ (রা.)-এর সাথে নবীজি (সা.)-এর বিবাহোত্তর ওলিমার মজলিসে। এরপর পর্যায়ক্রমে সূরা নূর এবং সূরা আহযাবে পর্দাসংক্রান্ত মোট সাতটি আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, পর্দার আয়াত সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। কারণ আমি ছিলাম এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) বিবাহের পর বধূবেশে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গৃহে আগমন করেন এবং গৃহে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ওলিমার জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করান এবং সাহাবায়ে কেরামকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর কিছু লোক পারস্পরিক কথাবার্তার জন্য সেখানে অনড় হয়ে বসে রইল। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা.)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং যয়নব (রা.)ও ছিলেন। তিনি সংকোচবশত প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিলেন। লোকজনের এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) কষ্ট অনুভব করছিলেন। তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে অন্য পত্নীদের সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের জন্য চলে গেলেন। তিনি ফিরে আসছেন দেখে তাদের সম্বিত ফিরে এল এবং স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘরে প্রবেশ করে অল্পক্ষণ পরে পুনরায় বের হয়ে এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি পর্দার আয়াত পাঠ করে শোনালেন, যা এখনই অবতীর্ণ হয়েছিল।

পর্দার স্বরূপ :

পর্দার সর্বপ্রথম আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হলো–

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

তোমরা তাঁদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। (সূরা আল-আহযাব- ৫৩)

উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে নবীজি (সা.) সর্বপ্রথম পর্দার স্বরূপ উম্মতের সামনে প্রকাশ করলেন। তিনি মজলিসে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের সামনে একটি পর্দা লটকিয়ে হযরত যয়নব (রা.)-কে আড়াল করলেন। তিনি কিন্তু হযরত যয়নব (রা.)-এর গায়ে চাদর বা বোরকা পরিয়ে দিতে পারতেন, তা না করে পর্দা লটকানোর মাধ্যমে এ কথা বোঝালেন যে আসল পর্দার বিধান এটাই যে নারীর দেহ অন্তরালে থাকবে, পরপুরুষের দৃষ্টি গোচর হবে না। হযরত উমর (রা.)-এর প্রত্যাশাও তা-ই ছিল। পূর্বে যার বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। নবীজি (সা.)-এর এই আমল থেকে পর্দার স্বরূপ সকলের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব উম্মুল মুমিনীনগণসহ সকল সাহাবার আমলী জিন্দেগীতে এর বাস্তবায়ন লক্ষ করা যায়। ঘরে কিংবা বাইরে সর্বাবস্থায় তাঁরা নিজেদেরকে পরপুরুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখতেন। ঘরে চার দেয়াল বা পর্দা লটকানোর মাধ্যমে আর সফরে হাওদাজ বা পালকির মাধ্যমে পর্দা রক্ষা করে থাকতেন।

পর্দা ও সতর :

পর্দা ও সতর দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। এ দুয়ের পার্থক্য না বোঝার কারণে অনেক সময় পর্দার আয়াত ও আহকাম বোঝতে ব্যত্যয় ঘটে। পর্দা ও সতরের মাঝে মৌলিকভাবে কিছু পার্থক্য রয়েছে

এক. সতর ঢেকে রাখা একটি মানবীয় স্বভাবজাত বিষয়। ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাত নির্বিশেষে সকল মানবের চাহিদা এটি। বরং ধর্ম বিধান চালুর পূর্বেও আদম-হাওয়া জান্নাতে অবস্থানকালের ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলে যখন তাঁদের সতর খুলে গেল তখন জান্নাতের বৃক্ষের পাতা দিয়ে তাঁরা সতর ঢাকতে লাগলেন। তাই আরব-আজম, মুসলিম-অমুসলিম সকলে সতর ঢেকে চলে। হ্যাঁ, এর পদ্ধতি বা সীমার মাঝে ভিন্নতা আছে

পক্ষান্তরে পর্দার বিধান সকল ধর্মে ছিল না, এমনকি ইসলামের শুরুর যামানায়ও ছিল না। বিভিন্ন ফেতনা রোধে পঞ্চম হিজরীতে এর বিধান জারি হয়।

দুই. সতর ঢাকা সর্বাবস্থায় ফরজ। মানুষের সম্মুখে বা নির্জনে, নামাযের ভেতরে বা বাইরে সকল অবস্থায় তা ফরজ। অতএব কেহ অন্ধকার ঘরে একাকী বিবস্ত্র হয়ে নামায আদায়

করলে তা সহীহ হয় না। পক্ষান্তরে পর্দা হয়ে থাকে শুধু পরপুরুষের নজর থেকে বাঁচার প্রয়োজনে।

তিন. সতর ঢাকা নারী-পুরুষ সকলের ওপর ফরজ। পক্ষান্তরে পর্দা নারী জাতির সাথে সম্পৃক্ত একটি বিধান।

চার. নারীদের চেহারা এবং দুই হাতের কবজি ব্যতীত সারা শরীর সতরের অন্তর্ভুক্ত। চেহারা এবং হাতের কবজি সতরের অন্তর্গত নয় বিধায় এগুলো খোলা রেখে নামায আদায় করা জায়েয। পক্ষান্তরে তাদের চেহারা এবং হাতের কবজিসহ আপাদমস্তক সারা শরীর পর্দার আওতাধীন।

এখানে এসে অনেকে হোঁচট খান। নারীদের চেহারা এবং হাতের কবজিকে সতরের হুকুম থেকে বাদ দেওয়ার দলিল থেকে তারা এগুলোর পর্দা নেই বলে প্রমাণ করতে চান। অথচ সতর আর পর্দার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে সূরা আন্‌নূরের একটি আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। উক্ত আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে, "তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।" (আন্‌নূর -৩১)

এই আয়াতে মূলত সতরের হুকুম বর্ণিত হয়েছে। অর্থৎ নারী দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সতরের অন্তর্ভুক্ত শুধু চেহারা এবং হাতের তালু ছাড়া। যেহেতু ঘরে কাজকর্ম সম্পাদন করতে গেলে সাধারণত এগুলো খুলে যায় তাই সতরের হুকুম থেকে এগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় তাদের জন্য কাজকর্ম করা কষ্টকর হয়ে যেত। এ ছাড়া মহিলাদের সারা শরীর সতরের অন্তর্ভুক্ত, যা ঢেকে রাখা ফরজ। এ আয়াতে নারীদের চেহারা ভিনপুরুষের সামনে খুলে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়নি। মোটকথা, এখানে শুধু সতরের আলোচনা করা হয়েছে। নারী দেহের কতটুকু সতর আর কতটুকু সতর নয়, এটা ব্যক্ত করা হয়েছে। নারীদের চেহারা কাদেরকে দেখাতে পারবে আর কাদের সাথে পর্দা করতে হবে–এ নিয়ে এখানে কোনো আলোচনা নেই। এটা আয়াতের পরের অংশে রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রী লোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। (আন্‌নূর-৩১)

উক্ত আয়াতের মাঝে চেহারার পর্দার হুকুম দেওয়া হয়েছে যে উল্লিখিত বারো শ্রেণীর মাহরাম ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সামনে নারীদের চেহারা বা হাতের কবজি খোলার অবকাশ নেই।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নারীরা নিজেদের সৌন্দর্য তথা চেহারা ও হাতের তালু শুধুমাত্র ওই সকল পুরুষদের সামনে খুলতে পারবে, যারা তার সাথে দেখা করতে পারে। অর্থাৎ চেহারা এবং হাতের কবজি শুধু মাহরামদের সামনে খোলা থাকতে পারে। রাস্তাঘাটে বা হাট-বাজারে চেহারা খোলা রেখে চলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। সারকথা হলো, উক্ত আয়াতের প্রথম অংশে নারীদের সতরের আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে তারা কোন কোন অঙ্গ খোলা রাখতে পারবে আর কোন কোন অঙ্গ ঢেকে রাখা ওয়াজিব। এরপর আয়াতের শেষ অংশে এই মাস'আলা আলোচনা করা হয়েছে যে নারীরা কার সামনে আসতে পারে। অতএব এখানে বলা হয়েছে, যে মাহরাম ছাড়া অন্য কারো সামনে চেহারা খোলা হারাম। (মাও. ইদরীস কান্ধালভী মা'আরেফুল কোরআন)

পর্দার প্রকার :

কোরআন-সুন্নায় পর্দা বিষয়ে যে সকল নির্দেশনা রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, শরীয়তে পর্দার যে বিধান দেওয়া হয়েছে তা মূলত 'হেযাবে আশখাছ' তথা নারী দেহের গোটা অবয়বকে ভিনপুরুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখা। এ হিসেবে ঘরের চার দেয়ালে অবস্থান তাদের জন্য আবশ্যক। তবে যেহেতু ইসলাম একটি সার্বজনীন ও কল্যাণের ধর্ম, তাই প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পর্দার স্বরূপ কী হবে তাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে পর্দার দ্বিতীয় স্তর। অর্থাৎ আপাদমস্তক বোরকা ইত্যাদির মাধ্যমে আবৃত করে বের হওয়া।

প্রথম স্তর :

পর্দার প্রথম স্তর যে সকল দলিল থেকে প্রতীয়মান হয় তা নিম্নরূপ–

১. হযরত যয়নব (রা.)-এর গৃহে অবতীর্ণ পর্দার সর্বপ্রথম আয়াত- "তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। (সূরা আহযাব-৫৩)

অর্থাৎ তোমাদের মাঝে এমন একটি পর্দা থাকবে, যা পরস্পরকে আড়াল করে রাখবে। এর বাস্তব নমুনা নবীজি (সা.) ওই মজলিসেই পেশ করে

দেখিয়ে দিয়েছেন। পর্দা টেনে হযরত যয়নব (রা.)-কে আড়াল করেছিলেন। চাদর দিয়ে তাঁর শরীর আবৃত করেননি। বোঝা গেল, দেহের অবয়বের পর্দাই আসল পর্দা, যা শরীয়তে কাম্য।

২. এর চেয়ে আরো স্পষ্ট সূরা আল আহযাবের অপর আয়াত। যাতে বলা হয়েছে, "তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে।" (সূরা আহযাব-৩৩)

এই আয়াতের নির্দেশ শুনে নবীপত্নী হযরত সাউদা (রা.) আজীবন ঘরে অবস্থান করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি হজ-উমরা করেন না কেন, যেভাবে অন্য সহধর্মিণীগণ করে থাকেন? তিনি বললেন, আমি ইতিপূর্বে হজ-উমরা আদায় করেছি। আমার প্রতি এখন আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করা। অতএব আল্লাহর কসম আমি আমৃত্যু ঘর থেকে বের হব না। বাস্তবে তা-ই হয়েছিল। ঘরের দরজার বাইরে তিনি কখনো বের হননি। অবশেষে তাঁর জানাযা বের হয়েছে।

হযরত উমর (রা.) পর্দার হুকুম নাজিল হওয়ার পূর্বে হযরত সাউদা (রা.)-কে রাতের আঁধারে দেখে যে মন্তব্য করেছিলেন তার উদ্দেশ্যও এটাই ছিল যে নারীদের অবস্থান গৃহের অন্দরমহলে হওয়া চাই। পর্দার এমন হুকুমই তিনি আশা করেছিলেন।

৩. হযরত উম্মে হুমাইদ (রা.)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস, যেখানে নবীজির (সা.) পেছনে নামায পড়ার ব্যাকুলতা এবং নবীজি (সা.) কর্তৃক তাঁকে গৃহে নামাযে উদ্বুদ্ধকরণের ঘটনা ব্যক্ত হয়েছে। নবীজি (সা.)-এর পেছনে এক ওয়াক্ত নামায আদায় সারা জীবনের নামায অপেক্ষা দামি হওয়া সত্ত্বেও ওই মহিলাকে ঘরে নামায আদায় করতে বলার পেছনে মূল হেতু এটাই ছিল যে নারীদের প্রথম স্তরের পর্দা হচ্ছে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান। অন্যথায় নারীদেরকে নবীজি (সা.)-এর পেছনে নামায আদায়ের ফজীলত থেকে বঞ্চিত করা হতো না।

৪. এ ব্যাপারে সবচেয়ে স্পষ্ট হাদীসটি হচ্ছে, "নারীদের নিজ গৃহ থেকে বের হওয়ার কোনো অধিকার নেই, হ্যাঁ, যদি কোনো অপারগতা দেখা দেয় তবে ভিন্ন কথা।" (তাবারানী ২/২০০)

৫. একদা নবীজি (সা.) সাহাবাদের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন যে বলো তো নারীদের মঙ্গল কিসে? কেউ যখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছিলেন না, তখন হযরত আলী (রা.) ঘরে গিয়ে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর কাছে প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, নারীগণ পুরুষদের দেখবে না, পুরুষগণও নারীদের দেখতে পাবে না, এর মাঝেই নারীদের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। (কানযুল উম্মাল-৪৬০১১)

এ ছাড়া ইফকের ঘটনায় আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাউদাজে ভ্রমণ এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিইয়্যা (রা.)-কে বিবাহ করে চাদর দিয়ে ঘিরে দেওয়ার ঘটনাসহ অসংখ্য হাদীসে এ কথার প্রমাণ মেলে যে পর্দার প্রথম এবং আসল স্তর হচ্ছে দেহাবয়বের পর্দা।

দ্বিতীয় স্তর :

শরয়ী জরুরতে নারীদের ঘরের বাইরে গমন করতে রাখা হয়েছে পর্দার দ্বিতীয় স্তর। যে সকল দলিল থেকে এ ক্ষেত্রে চেহারাসহ আপাদমস্তক ঢেকে পর্দা করার কথা বোঝা যায় তা নিম্নরূপ–

১. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে, কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। (সূরা আহযাব-৫৯)

এখানে বিশেষ একটি চাদরের কথা বলা হয়েছে, যা ওড়নার ওপর পরিধান করা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, নারীরা চাদর মাথার ওপর থেকে ঝুলিয়ে চেহারা ঢেকে নেবে। শুধুমাত্র একটি চোখ খোলা রাখবে।

হযরত ওবায়দা সালমানী (রহ.)-কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি মস্তকের ওপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের ওপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বাম চক্ষু খোলা রেখে এর তাফসীর কার্যত দেখিয়ে দিলেন। অতএব এ আয়াত পরিষ্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে।

২. জনৈকা মহিলা এসে নবীজি (সা.)-কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! অনেকের কাছে লম্বা চাদর নেই, সে কী করবে? নবীজি (সা.) বললেন, তার সখী যেন নিজের চাদর তাকে পরিধান করতে দেয়।" (বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ বাইরে গেলে অবশ্যই চাদর টেনে মুখমণ্ডল ঢেকে নিতে হবে। নিজের কাছে চাদর না থাকলে অন্যের কাছ থেকে নিয়ে হলেও আমল করতে হবে।

৩. উম্মে খল্লাদ নামক এক মহিলা

নবীজি (সা.)-এর কাছে এসে তার শহীদ ছেলের সন্ধান জানতে চাইল। মহিলাটি ঘোমটা দিয়ে চেহারা ঢেকে ছিল। সাহাবাদের একজন তাকে উদ্দেশ করে বললেন, ছেলের সন্ধান জানতে এসেছেন আবার ঘোমটা দিয়েছেন কেন? তিনি বললেন, আমার ছেলে হারাতে পারি, কিন্তু লজ্জা-শরম তো আর হারাতে পারি না। নবীজি (সা.) বললেন, তোমার ছেলে দুজন শহীদের সাওয়াব পাবে। (আবু দাউদ)

বোঝা গেল, প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে ঘোমটা ইত্যাদির মাধ্যমে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতে হবে।

৪. হযরত সাউদা (রা.)-এর প্রসিদ্ধ ঘটনা। দীর্ঘ ওই হাদীসের শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জরুরতের সময় বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। (বুখারী) তাই শরয়ী জরুরতে আপাদমস্তক ঢেকে দ্বিতীয় স্তরের পর্দা অবলম্বন বৈধ করা হয়েছে।

৫. এক হাদীসে এসেছে, নারীদের জন্য রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলাচল আবশ্যক। (তাবারানী) এ সকল দলিল থেকে পর্দার দ্বিতীয় স্তর প্রমাণিত হয়।

চেহারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত :

ইসলামে পর্দার বিধান হচ্ছে নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা এবং যেনা-ব্যাভিচার দমনের মাধ্যমে নারীর সতীত্ব সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নারী দেহে তার চেহারা সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ। পরপুরুষের সামনে তাদের চেহারা খোলা রাখার অনুমতি হলে পর্দার উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়া নিশ্চিত। সম্ভ্রান্ত নারীগণ সব সময় পরপুরুষ থেকে নিজের চেহারা আড়াল করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকে। পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগমুহূর্তের যে দৃশ্য হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে তাতে দেখা যায় হযরত যয়নব (রা.) সাহাবাদের থেকে নিজের চেহারা আড়াল করতে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন। মুসলিম-অমুসলিম সব নারীদের মাঝেই এই লাজুকতা পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেশের হিন্দু মহিলারাও কি ঘোমটা দিয়ে ভিনপুরুষ থেকে চেহারা আড়াল করে না? নারীদের এই লজ্জা ভাঙাতে ইসলাম কি তাদের চেহারা পর্দার আওতামুক্ত ঘোষণা করতে পারে?

চেহারা ঢাকার নির্দেশ :

সূরা আল আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, নারীগণ যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ মাথার ওপর থেকে ঝুলিয়ে চেহারা ঢেকে নেয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত সালমানী (রা.)-এর প্রদত্ত তাফসীর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

বৃদ্ধা ও যুবতীর তফাত :

বৃদ্ধা নারীদের প্রতি পর্দার বিধান কিছুটা শিথিল করে এক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, "বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের (বাড়তি) বস্ত্র (বহির্বাস, গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে) খুলে রাখে এতে তাদের জন্য দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্ব শ্রোতা সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর-৬০)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উভয়ের মতে এই আয়াতে উল্লিখিত বস্ত্র দ্বারা উদ্দেশ্য জিলবাব তথা এমন চাদর, যা ওড়নার ওপরে পরিধান করা হয়। অর্থাৎ সূরা আল আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে জিলবাব তথা চাদর দ্বারা চেহারা আবৃত করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার মাঝে ব্যতিক্রম হলো বৃদ্ধা নারী। চেহারা ঢাকার বিধান বৃদ্ধা নারীর বেলায় শিথিল করা এ আয়াতের উদ্দেশ্য। বোঝা গেল যে এ শিথিলতা বৃদ্ধা নারীদের জন্য সীমাবদ্ধ। কাজেই যুবতীদের জন্য চেহারা বা হাতের কবজি পরপুরুষের সামনে খোলার অবকাশ নেই। কেননা তা মূল পর্দার বিধানের মাঝে বহাল রয়েছে। এখন যদি যুবতীদের জন্যও চেহারা খোলার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে এ আয়াতে বর্ণিত বৃদ্ধাদের বৈশিষ্ট্য বাকি থাকে না, যা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার পরিপন্থী।

বেগানা পুরুষ থেকে চেহারা ঢাকা :

নারীদের সৌন্দর্য তথা চেহারা এবং হাতের কবজি কাদের সামনে খোলা রাখা যাবে। এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা সূরা আন্‌নূরের ৩১ নং আয়াতে প্রদান করা হয়েছে। সতর ও পর্দায় ব্যবধানের আলোচনা, যা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত আয়াতে গুনে গুনে বারো শ্রেণীর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে। এর বাইরে কারো সামনে নারীদের সৌন্দর্য তথা চেহারা ও হাতের কবজি খোলা যাবে না।

গহনার শব্দের পর্দা :

সূরা আন্‌নূরের ৩১ নং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, "তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।

অর্থাৎ নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যদ্দরুন অলঙ্কারাদির আওয়াজ ভেসে ওঠে এবং তাদের বিশেষ সাজসজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ফেতনার আশঙ্কায় গহনার শব্দ প্রকাশ যদি নিষেধ হয় তবে গহনার অঙ্গ প্রকাশ বৈধ হবে কী করে। অতএব তাদের গহনার অঙ্গ তথা চেহারা ও হাতের কবজি অবশ্যই পর্দার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর আমল :

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হজের সফরে ছিলাম। আমাদের পাশ দিয়ে অনেক আরোহী অতিক্রম করত। যখন তারা আমাদের বরাবর চলে আসত তখন আমাদের প্রত্যেকে মাথা থেকে চাদর টেনে মুখমণ্ডল ঢেকে নিতাম এবং আমাদের অতিক্রম করে চলে গেলে পুনরায় চেহারা খুলে নিতাম। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

ইফকের ঘটনা :

ভুলবশত হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-কে পেছনে রেখে কাফেলা চলে গেল। কাফেলার পেছনে অনুসন্ধানের দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবী এসে তাঁকে দেখে 'ইন্নালিল্লাহ... বলে উঠলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) পরপুরুষের উপস্থিতি টের পেয়ে সাথে সাথে চেহারা ঢেকে নিলেন। (বুখারী)

কোরআন-সুন্নাহর এ সকল বক্তব্য থেকে বোঝা গেল, নারীদের চেহারা ও হাতের কবজি পর্দার অন্তর্ভুক্ত। গোটা শরীর পরপুরুষ থেকে আবৃত করা যেমন ফরজ চেহারা ঢাকাও ফরজ।

চার মাযহাব মতে :

তিন ইমাম তথা ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম শাফেঈ (রহ.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, নারীদের চেহারা এবং হাতের কবজি পর্দার অন্তর্ভুক্ত, চাই ফেতনার ভয় থাক বা না থাক। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব মতে, বিষয়টি ফেতনামুক্ত হওয়া না হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। শতভাগ ফেতনামুক্ত হলে এগুলোর পর্দা লাগবে না আর যদি এক পার্সেন্ট ফেতনার সন্দেহ হয়, তবে চেহারা এবং হাত-পায়ের পর্দা রক্ষা করতে হবে। আর যেহেতু শতভাগ ফেতনামুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, যা অস্বীকারের উপায় নেই। তাই হানাফী মাযহাব মতেও চেহারা খোলা রাখার অবকাশ নেই। ফলশ্রুতিতে চারো মাযহাবের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাস্তবতার দিক দিয়ে চার মাযহাব এ কথার ওপর এক মত যে চেহারার পর্দা করা আবশ্যক।

ফেতনার যুগে চেহারার পর্দা :

হানাফী মাযহাব মতে, নারীদের চেহারা খোলা রাখার বৈধতার জন্য শর্ত হচেছ ফেতনামুক্ত হওয়ার শতভাগ নিশ্চয়তা। এ শর্তটি নবীজি (সা.) এবং সাহাবাদের সোনালি যুগেও যে কত দুর্লভ ছিল, তা অনুমান করা যায় কয়েকটি ঘটনা থেকে।

নবীজির (সা.) পবিত্র যুগে, পবিত্র শহরে স্বয়ং নবীজি (সা.)-এর সাথে একই বাহনে আরোহিত অবস্থায়ও হযরত ফজল ইবনে আববাস (রা.)-কে নবীজি (সা.) ফেতনামুক্ত ভাবতে পারেননি। তাই তিনি জনৈকা খাসআমা নামক মহিলা সাহাবীর দিকে তাকালে নবীজি (সা.) তাঁর চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমি এক যুবক ও যুবতীকে দেখলাম কিন্তু তাদেরকে ফেতনামুক্ত ভাবতে পারেনি। (বুখারী)

অপর হাদীসে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, নারীরা যে কর্মকাণ্ড শুরু করেছে নবীজি (সা.) যদি তা দেখতেন তবে তাদের মসজিদে গমন নিষেধ করে দিতেন। (বুখারী)

অতএব সোনালি যুগে যদি ফেতনার এমন রূপ হয় তবে বর্তমান যুগের লোকদের অবস্থা কী হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এ যুগের ভয়াবহ ফেতনা সম্পর্কে সকলেই অবগত। এমতাবস্থায় হানাফী মাযহাব মতেও চেহারার পর্দা ফরজ। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বিস্তারিত দেখুন- (আদ্দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, সিরাজিয়া, হিন্দিয়া ও আহকামুল কোরআন ইত্যাদি গ্রন্থে)

জবাব দেবেন কী?

ইসলামের পর্দার বিধানকে পাশ কাটিয়ে বিভিন্ন ফাঁক-ফোঁকর বের করে যারা নারীদের চেহারায় পর্দা লাগে না বলে অপপ্রচার করছে পূর্ণাঙ্গ পর্দা পরিপালনে আগ্রহী পর্দানশীন মা-বোনদের চেহারা বেপর্দা করতে যারা উদগ্রিব, বেপর্দা নারীদের পর্দায় আনতে তাদের খুব একটা ভূমিকা রাখতে দেখা যায় না। মনে রাখা উচিত যে মুসলিম সমাজে নারীদের সতীত্ব আর সন্তানের ঔরস সংরক্ষিত থাকার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে পর্দার বিধান। এ বিধানের প্রতি ন্যূনতম ভ্রুক্ষেপ না করার ফলে

পশ্চিমা সমাজের বেহাল দশা–সকলের জানা। পিতৃপরিচয় না থাকা সেখানে গর্বের বিষয়ে পরিণত হতে চলছে। এমন পরিস্থিতিতে নিরাপদ বেষ্টনী ভেঙে নারীদের চেহারা পর্দাহীন করতে কোরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। নারীদের চেহারা যদি পরপুরুষের সামনে খোলা বৈধই হয়, তবে সূরা আন্‌নূরের ৩১ নং আয়াতে বারো শ্রেণীর মাহরামের আলোচনার অর্থ কী হতে পারে?

যদি খোলা চেহারায় পুরুষের সামনে আসা বৈধ হয় তবে পবিত্র কোরআনে নারী-পুরুষের দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশের কী মানে হতে পারে।

যদি চেহারা খুলে ঘোরাফেরার অনুমতি থাকে তবে "তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে।" (আহযাব-৩৩) কোরআনের এমন নির্দেশ জারির কী প্রয়োজন ছিল? যদি চেহারা খুলে ভিনপুরুষের সামনে আসা বৈধ হয় তবে "পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।" (আহযাব-৫৩) কোরআনে এই নির্দেশ কেন দেওয়া হলো? বোঝা গেল, পর্দার আড়াল থেকে চাওয়া অন্তরের পবিত্রতার সহায়ক আর চেহারা খুলে সামনে এসে চাওয়া অন্তর নাপাক হওয়ার কারণ।

যদি চেহারা খুলে ভিনপুরুষের সামনে আসা বৈধ হয় তবে "পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না।" (আহযাব-৩২) এর মর্ম কী হতে পারে।

যদি নারীদের চেহারার পর্দা না-ই থাকে, তবে হাদীস শরীফে কেন বলা হয়েছে চোখের যেনা হচ্ছে দেখা। (মুসলিম)

যদি চেহারা পর্দার গণ্ডিভুক্ত না হয় তবে হাদীস শরীফে কেন বলা হয়েছে "দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর ওপর আল্লাহর অভিশাপ।" (মেশকাত)

যদি চেহারার পর্দা ফরজ না হতো তবে নবীজি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে কেন বললেন– "দ্বিতীয় দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ নয়।" (তিরমিযী)

এ সকল প্রশ্নের সহজ উত্তর হচ্ছে নারীদের চেহারার পর্দাও শরীরের বাকি অঙ্গের মতো ফরজ। অতএব ফেতনার এ যুগে চেহারার পর্দা নেই বলে বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখার কোনোই অবকাশ নেই।

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেওয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেওয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেওয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রিম বা জামানত নেওয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম
বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২২

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

Credit Money ক্রেডিট মানি

Credit-কে আরবীতে ائتمان বলা হয়, যার অর্থ আস্থা ও বিশ্বাস।

Credit-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকাতে Credit-এর সংজ্ঞা এভাবে এসেছে–

Transaction between two parties in whice one the (Creditor or lender) Supplies Money Goods, Servieces or Securities in Returt for a promised future payment by the other (the Debtor or borrower) (Britannica V, 3 P 722)

অর্থাৎ ক্রেডিট এমন লেনদেনের নাম, যাতে একপক্ষ মুদ্রা, পণ্য, সেবা অথবা নিরাপত্তা সরবরাহ করে, পক্ষান্তরে অপরপক্ষ পরবর্তীতে অঙ্গীকারকৃত সময়ে তা পরিশোধ করে।

সংক্ষেপে ক্রেডিটের সংজ্ঞা :

Present Right to a future Peyment,

(Foot note on Introduction to Economics Principles P 341)

অর্থাৎ পরবর্তীতে পরিশোধের ওপর বর্তমান অধিকারের নাম ক্রেডিট।

ক্রেডিটের আরো একটি সংজ্ঞা–

يعرف الائتمان بانه تنازل من مال حاضر لقاء مال مستقبل واساسه الثقة (القاموس الاقتصادى النجفى ٨٨)

অর্থাৎ ক্রেডিটের সংজ্ঞা এভাবে করা যায় যে পরবর্তীতে মালের পরিবর্তে বর্তমানে মাল ছেড়ে দেওয়া এবং এর ভিত্তি আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর হওয়া।

আরো একটি সংজ্ঞা–

منح حق استخدام او امتلاك السلع والخدمات دون دفع القيمة فورا (موسوعة المصطلحات الاقتصادية ١٨٢)

এই সংজ্ঞার সারকথাও পূর্বের সংজ্ঞার মতো।

অপর একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

اعتبار سے مراد بھروسہ، یقین یا اعتماد ہے، جو قارض اپنے کسی مقروض پر اسے قرضہ دیتے وقت یا ادھار مال دیتے وقت کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مقروض اسے طی شدہ مدت کے بعد قرض کی رقم واپس کردیگا، یا اس نے ادھار پر جو مال خریدا تھا اس کی قیمت ادا کریگا (تعارف زر وبینکاری، شیخ مبارک علی ۲۲۱)

যার মর্মার্থ হলো, ক্রেডিট ভরসা, আস্থা ও বিশ্বাসের নাম, যাতে এর ওপর ভিত্তি করে বাকিতে লেনদেন হয়ে থাকে।

ক্রেডিট মানির সংজ্ঞা :

صكوك مكتوبة بشكل قانونى محدد تتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود فى وقت معين او قابل للتعين ويمكن نقل الحق الثابت بطريق التظهير والمناولة (احكام الاوراق النقدية والتجارية للجعيد ٢٢١)

অর্থাৎ লিখিত ডকুমেন্ট, যা সীমিত আকারের হবে এবং আইনগতভাবে হবে। যাতে এই নিশ্চয়তা ও গ্যারান্টি উল্লেখ থাকবে যে একটা নির্ধারিত সময়ে মুদ্রার বিশেষ একটা পরিমাণ এর ওপর ভিত্তি করে দেওয়া যাবে। যেই পাওনা এর ওপর ওয়াজিব হবে তা এনডোর্সকরণের মাধ্যমে হস্তান্তর করা যাবে।

ড. মুহাম্মদ জকি শাফেয়ী এ বিষয়ে লিখেন–

ومن هنا يطلق عليها اصطلاح النقود الائتمانية لان الائتمان عبارة عن الوعد بدفع مبلغ من النقود ومن هنا ايضا ليست النقود الائتمانية سوى ديون تترتب لصالح حاملها فى ذمة الدولة او البنوك وتعتمد فيما تتمتع به من قبول عام فى المعاملات على عنصر الثقة (مقدمة فى النقود والبنوك ٤٣)

অর্থাৎ এ কারণেই ওইগুলোকে Credit Money বলা হয়, কেননা ক্রেডিট মুদ্রার বিশেষ পরিমাণ দেওয়ার অঙ্গীকারের নাম। এ কারণেই 'ক্রেডিট মানি' ঋণ, যা রাষ্ট্র অথবা ব্যাংকের জিম্মায় বাহকদের জন্য ওয়াজিব হয়। আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই লেনদেনের মধ্যে সাধারণত গ্রহণ করা হয়।

ক্রেডিট মানির সহজে আরো একটি সংজ্ঞা পেশ করা যায়–

قرض کی صورت میں لین دین کرنے یا ادھار پر مال کا لین دین کرنے کو اعتبار کہا جاتا ہے اور اس مقصد کیلئے جو تحریری وعدہ بطور آلہ استعمال کیا جاتا ہے اسے اعتباری

فالنقود الورقية هي نقود ائتمانية لكونها ائتمانا يمنحه من يملك هذه النقود للجهة التى اصدرتها اى انها دين والتزام فى ذمة المصرف المصدر لها (النقود الائتمانية)

তিনি তাঁর উপর্যুক্ত বক্তব্যে কারেন্সি নোটকেও 'ক্রেডিট মানি'র অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(৫) শায়খ মোবারক আলী বলেন,

آلات اعتبار کی مختلف اقسام کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے، چیک Cheque مبادلتی بل یا مبادلتی ہنڈی Bill of Exchange اقرار نامہ Promissory Notes مطالبتی بینک ڈرافٹ Bank Draft (تعارف زر و بینکاری ۲۶۴)

তাঁর বর্ণনা মতে চেক, প্রমিসরি নোট, হুন্ডি, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি ক্রেডিট মানির প্রকার।

'ক্রেডিট মানি'র গোড়াপত্তন :

এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে চেক, হুন্ডি ইত্যাদির অগ্রযাত্রা ব্যাংকিংয়ের অগ্রযাত্রার সাথেই হয়েছিল। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো–

কিছু কিছু অর্থনীতিবিদের ধারণা মতে, হুন্ডি বর্তমান পদ্ধতিতে মধ্য শতাব্দীসমূহে পরিচিতি লাভ করে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে ইংরেজি অষ্টাদশ শতাব্দীতেই পরিচিতি লাভ করে এবং এর গোড়াপত্তন এভাবে হয় যে এটাকে বাঈ ছরফের জন্য মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

অর্থাৎ এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রার সাথে বিনিময়ের সময় হুন্ডির পদ্ধতিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

"চেক" ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী

زر کا نام دیا جاتا ہے (تعارف زر و بینکاری شیخ مبارک علی ۲۲۱)

অর্থাৎ ঋণের পদ্ধতিতে লেনদেন করা অথবা বাকিতে লেনদেন করাকে ক্রেডিট বলা হয়, এই উদ্দেশ্যে, যেই লিখিত অঙ্গীকারকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাকে 'ক্রেডিট মানি' বলা হয়।

'ক্রেডিট মানি'র চার বৈশিষ্ট্য :

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো দ্বারা বোঝা যায়, 'ক্রেডিট মানি'তে চারটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়–

১. এতে এনডোর্সকরণের (Endorsment) মাধ্যমে লেনদেন করা হয়।

২. ঋণের ক্ষেত্র মুদ্রার বিশেষ পরিমাণ হয়।

৩. লেনদেনের ক্ষেত্রে মুদ্রার ভূমিকা পালন করে।

৪. বিশেষ আঙ্গিকে (সীমিত এবং আইনগত) লিখিত ডকুমেন্ট হয়।

'ক্রেডিট মানি'র প্রসিদ্ধ প্রকারসমূহ :

১. হুন্ডি Bill of Exchange

২. ঋণপত্র Bonds

৩. চেক Cheque

৪. প্রমিসরি নোট Promissory Note

৫. ব্যাংক ড্রাফট Bank Draft

উল্লেখ্য, অনেকেই কারেন্সি নোটকে 'ক্রেডিট মানি'র অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কারেন্সি নোট বিষয়ে পূর্বের বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেছে যে বর্তমান সময়ে কারেন্সি নোট স্বয়ং 'ছমন' তাই শরয়ী এবং আইনিভাবে কারেন্সি নোট অন্যান্য ক্রেডিট মানির মতো হবে না বরং ভিন্ন। 'ক্রেডিট মানি'র প্রকারসংক্রান্ত কিছু নমুনা নিম্নে পেশ করা হলো–

(১) আল জায়ীদ বলেন,

تقتسم الاوراق التجارية الى ثلاثة انواع، اولا الكمبيالة ثانيا السند ثالثا الشيك (احكام الاوراق النقدية والتجارية للجعيد ٢٢١)

অর্থাৎ ক্রেডিট মানির তিনটা প্রকার :

১. হুন্ডি Bill of Exchange

২. ঋণপত্র Bonds

৩. চেক Cheque

(২) ড. এ এন আগার ওয়াল বলেন,

We shall Now discuss the chief forms of Credit instruments : Promissory notes Bank notes and Currency Notes Bill of Exchange... Chaque... Bank Draft.

(Introduction To Economics Principles P 352)

অর্থাৎ এখন আমরা Credit Money-এর মৌলিক কিছু প্রকার উল্লেখ করছি, প্রমিসরি নোট, ব্যাংকনোট, কারেন্সি নোট, হুন্ডি, চেক, ব্যাংক ড্রাফট।

(৩) হাসান নাযাফী বলেন,

وادوات الائتمان هي الاوراق التجارية الممثلة بالسفتجة والسند الاذني والشيك وهي اوراق قابلة للتحويل وتستخدم فى عمليات الائتمان لآجال قصيرة اوراق البنكوت، الاوراق المالية وهي الاسهم والسندات (القاموس الاقتصادية النجفى ٨٨)

তিনি উপরোক্ত বক্তব্যে শেয়ার এবং বিভিন্ন প্রকারের সার্টিফিকেটকেও 'ক্রেডিট মানি'র অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(৪) ইবরাহীম সালেহ ওমর বলেন,

সময় থেকেই পরিচিতি লাভ করে। চেক পরিচিতি লাভের উৎস হলো কমার্শিয়াল ব্যাংক। তবে এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে 'ক্রেডিট মানি'র ভিত্তি অনেক প্রাচীন, যা ফুকাহায়ে কেরামের প্রাচীন কিতাবসমূহে "সুফতাজাহ'-এর আলোচনা থেকে ধারণা পাওয়া যায়। তদ্রূপ ফিকহের সব কিতাবে 'হাওয়ালা'-এর উল্লেখ রয়েছে এবং এর বিস্তারিত বিধিবিধানও ফিকহের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় ইউরোপের লেনদেনের মূল ভিত্তি এটাই। প্রাচ্যবিদদের মধ্যে অনেকেই এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। যথা–জোসেফের মতে, Cheque ফ্রান্সি শব্দ, যা হাওয়ালার পরিবর্তিত রূপ। অথবা এটাও হতে পারে যে Cheque আরবী শব্দ صك ডকুমেন্টের পরিবর্তিত রূপ। রোবসন বলেন, অ্যারাবিয়ান ব্যবসায়ীরা ব্যবসার জগতে অনেক অগ্রগামী। কেননা তারা ব্যবসাকে অফিশিয়াল রূপ দিয়েছে। নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থে বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করেছে, "সুফতাজাহ" বা হুন্ডির প্রচলন করেছে। ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে সাহাবায়ে কেরামের যুগে "সুকূক"-এর প্রচলন ছিল। সাহাবায়ে কেরাম সুকূক দ্বারা লেনদেন করা থেকে নিষেধও করেছেন। কেননা ওই সুকূক ছিল খাদ্যদ্রব্যের। খাদ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় কবজ করার পূর্বে নাজায়েয। (আহকামুল আওরাকিননকদিয়্যাহ লিল জায়ীদ)

এ বিষয়ে হযরত ইমাম মালেক (রহ) রচিত মুআত্তা গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে,

وحدثنى عن مالك انه بلغه ان صكوكا خرجت للناس فى زمان مروان بن الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل ان يستوفوها فدخل زيد بن ثابت ورجل من اصحاب النبى ﷺ على مروان بن الحكم فقالا اتحل الربا يا مروان؟ فقال اعوذ بالله وما ذلك؟ فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوها فبعث مروان بن الحكم الحرس يتتبعونها ينزعونها من ايدى الناس ويردونها الى اهلها۔

يقول الشيخ الكاندهلوى رحمه الله تعالى تحته: صكوك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين والمراد ههنا الورقة التى يكتب فيها ولى الامر برزق من الطعام لمستحقيه بان لفلان كذا وكذا من الطعام وغيره (اوجز المسالك ١١/٢٠٢)

অর্থাৎ মুআত্তা গ্রন্থে ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, মরওয়ান ইবনুল হাকামের যুগে মানুষের মাঝে খাদ্যের সুকূক প্রকাশ পায়। মানুষ কবজ করার পূর্বে ওইগুলোর লেনদেন করতে থাকে। এমতাবস্থায় সাহাবী হযরত যাইদ ইবনে সাবিত অন্য আরো একজন সঙ্গী সাহাবীকে নিয়ে মরওয়ান ইবনুল হাকামের দরবারে গমন করলেন এবং বললেন আপনি কি সুদকে বৈধতা দিতে যাচ্ছেন? প্রতি উত্তরে মরওয়ান বললেন, নাউযুবিল্লাহ, এটা কিভাবে হবে? সাহাবীদ্বয় বললেন, এই সুকূকগুলো মানুষ যেগুলোকে কবজ করার পূর্বেই ক্রয়-বিক্রয় করছে। অতঃপর মরওয়ান নিরাপত্তা রক্ষীদের পাঠিয়ে সুকূকগুলো জব্দ করে নিলেন এবং মূল মালিকদের নিকট ফেরত দিলেন। এর ব্যাখ্যায় হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) লিখেন–

صك (সক)-এর বহুবচন। অর্থাৎ ওই কাগজ বা ডকুমেন্ট যাতে ঋণ লিপিবদ্ধ থাকে। এ ক্ষেত্রে সুকূক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ওই ডকুমেন্ট যাতে শাসক রেশনযোগ্য ব্যক্তিদের জন্য রেশন লিখে দিতেন যে অমুকের এত কেজি খাদ্য, অমুকের জন্য এত।

উপরোক্ত রেওয়ায়ত দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে 'ক্রেডিট মানি'র প্রচলন অনেক প্রাচীন। তবে পরবর্তী সময় এর উন্নত রূপ নতুন আকৃতিতে বাজারে এসেছে।

'ক্রেডিট মানি' এবং এর ভূমিকা ও উপকারিতা :

'ক্রেডিট মানি'র অর্থনৈতিক অনেক উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিম্নে পেশ করা হলো–

১. মুদ্রা বা নোট বহনের প্রয়োজন। অর্থাৎ ক্রেডিট মানির গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য উপকারিতা হলো, এর ফলে ক্যাশ টাকা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ঝুঁকি এড়ানো যায়। অথচ সবারই জানা কথা যে মানুষ পারস্পরিক লেনদেন সম্পাদনের জন্য মুদ্রা সাথে রাখার প্রয়োজন পড়ে। যথা– কোনো জিনিস কেনাকাটা করার জন্য অথবা কাউকে ঋণ দেওয়ার জন্য বা ঋণ পরিশোধ করার জন্য ইত্যাদি। 'ক্রেডিট মানি'র ফলে মানুষ ওই ঝুঁকি ও কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে। যার ফলে চুরি ইত্যাদির শঙ্কা আর থাকে না। এই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই Bill of

Exchange আবিষ্কৃত হয়েছে। চেক Chequeও উপরোক্ত ভূমিকা পালন করে।

২. পরিশোধের মাধ্যম। (Instrument of Payment) ক্রেডিট মানি পাওনা পরিশোধের মাধ্যম, ফলে পাওনা পরিশোধ সহজেই করা যায়। যথা–চেক Cheque ইত্যাদি।

৩. আস্থা ও নির্ভরতার মাধ্যম। (Instrument of Credit) ক্রেডিট মানিকে ক্রেডিট মানি এ জন্য বলা হয় যে এর ফলে আস্থা ও নির্ভরতা সৃষ্টি হয়। যথা–এই আস্থার ওপর ভিত্তি করে পারস্পরিক লেনদেন হয়। আস্থা ক্রেডিট মানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

চেক (Cheque) সিস্টেমের উপকারিতা :

চেকের মাধ্যমে লেনদেন পদ্ধতির রয়েছে অনেক উপকারিতা। যথা–

(১) সহজ ও স্বল্প ব্যয়। চেক পাওনা পরিশোধ ও আদায়ের সহজ ও স্বল্প ব্যয়ভিত্তিক মাধ্যম অল্প টাকা থেকে বেশি টাকার আদায় কাগজের ছোট্ট একটা টুকরার মাধ্যমে। নির্ভয়ে এবং নিরাপদে সময় নষ্ট করা ছাড়া সম্পাদিত হয়। এরই ফলে উন্নত বিশ্বে বড় বড় কাজকর্ম ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান ক্যাশ টাকার পরিবর্তে চেকের মাধ্যমে লেনদেন অধিক সহজ ও অতি নিরাপদ মনে করে। তাই তারা পাওনা, দেনার ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করে থাকে।

(২) পরিশোধের নিরাপদ মাধ্যম। চেককে পাওনা-দেনা পরিশোধের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ব্যবসায়ীরা পরস্পর পাওনা-দেনা পরিশোধের জন্য সাধারণত ক্রস চেক ব্যবহার করে থাকে। এ ধরনের চেক যেহেতু যেই প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নামে ইস্যু করা হয়, সেই কেবলমাত্র নিজের অ্যাকাউন্টে জমা করার পর প্রাপ্তিযোগ্য হয়। তাই ওইগুলো চুরি বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও এতে উল্লিখিত টাকা নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে না। তাছাড়া পরিশোধের রসিদের আইনগত চাহিদাও পূরণ করে।

(৩) সুবিধাজনক কর্মকৌশল। চেক (Cheque) ব্যবহারের ফলে নগদ মুদ্রার ব্যবহার কমে যায়। এর দ্বারা নগদ মুদ্রার লেনদেন সাশ্রয়ী হয় এবং বড় অংকের লেনদেন কেবলমাত্র অ্যাকাউন্টে জমা করার মাধ্যমে হয়ে যায়। উক্ত প্রক্রিয়ায় নগদ মুদ্রার পারস্পরিক আদান-প্রদান, গণনা, এক স্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া ও হেফাজত করার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তা ছাড়া চেক (Cheque) পাওনা-দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুবিধাজনক কর্মকৌশলে পরিণত হয়, ফলে বাণিজ্যিক কাজকর্মের বিস্তৃতি সাধনের বড় ধরনের সহায়ক হয়।

বিনিময় বিল (Bill of exchange)-এর উপকারিতা :

আস্থা ও বিশ্বাসনির্ভর লেনদেনে বিনিময় বিল (Bill of exchange)-এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। যথা–

১. বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত। এই ধরনের বিল আন্তদেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিময়ের মাধ্যম (Medium of exchange)-এর ভূমিকা পালন করে। ব্যবসায়িক লেনদেনে পাওনা-দেনা পরিশোধের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে মনে করা হয়।

২. উভয় পক্ষের জন্য উপকারিতার মাধ্যম। বিনিময় বিল পদ্ধতিতে একদিকে বাকিতে মাল বিক্রেতার জন্য নিজের টাকা উসুল না হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। অন্যদিকে মাল ক্রেতার জন্য বিনিময় বিলের উসিলায় এই সুবিধা অর্জিত হয় যে সে নগদ টাকা আদায় করা ব্যতীত কাঙ্ক্ষিত পণ্য ক্রয় করতে সক্ষম হয়। বিলের পরিশোধ বিলের মেয়াদ শেষান্তে করা যায়। ফলে ওই সময় আসা পর্যন্ত মাল বিকিকিনি হয়ে যায়। এভাবে বিনিময় বিল (Bill of exchange) ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের মাঝে বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়ে দেনা-পাওনা পরিশোধের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে উভয় পক্ষ উপকৃত হয়।

৩. দেনা-পাওনা পরিশোধের নিরাপদ মাধ্যম। বিনিময় বিল (Bill of exchange) দেনা-পাওনা পরিশোধের এক নিরাপদ মাধ্যম হওয়ার ভূমিকা এবং সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়। কেননা বিল পরিশোধ না করলে বিলের বাহক উক্ত বিলের মাধ্যমে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে খুব সহজেই বিল উসুল করে নিতে পারে।

৪. বিলের ওপর বাট্টার উপকারিতা। বিনিময় বিল (Bill of exchange) সময় আসার পূর্বেও ক্যাশ হতে পারে। তবে এর জন্য সময় আসার পূর্বে উক্ত বিল ব্যাংকের নিকট বাট্টার জন্য পেশ করতে হবে। এমতাবস্থায়

ব্যাংক বিলের অবশিষ্ট সময়ের সুদ নির্ধারিত হারে কেটে রেখে অবশিষ্ট টাকা ক্যাশ আদায় করে দেয়।

ক্রেডিট মানি নির্ভরযোগ্য হওয়ার শর্তসমূহ :

আইনজ্ঞদের নিকট ক্রেডিট মানি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রয়েছে বিশেষ কিছু শর্ত। যেগুলো ব্যতীত ক্রেডিট মানি মুদ্রাই নয় এবং আইনগতভাবে ওইগুলোর সাথে তখন মুদ্রার মতো লেনদেন করা যাবে না। নিচে ওই শর্তগুলোর সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো–

(১) পারস্পরিক সন্তুষ্টি। এই শর্তটি সইকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (Drawer) এবং যার অনুকূলে সই করা হচ্ছে (Drawee) উভয়ের মধ্যে পাওয়া যেতে হবে। সইকারীর পক্ষ থেকে এর ওপর সই থাকা এবং যার জন্য সই করা হয়েছে সে গ্রহণ করাই উভয়ের সম্মতি এবং সন্তুষ্টির দলিল।

(২) কারণ। অর্থাৎ যেই কারণে এই ডকুমেন্ট তৈরি করা হয় ওই উদ্দেশ্য নির্ধারিত থাকতে হবে।

(৩) পাত্র। অর্থাৎ যার বদৌলতে, ক্রেডিট মানি মুদ্রাই পরিণত হয়, তা হলো নগদ টাকা। অর্থাৎ ক্রেডিট মানির পাত্র হলো নগদ টাকা। তাই পণ্য ইত্যাদির ওপর অন্তর্ভুক্ত ডকুমেন্ট ক্রেডিট মানি হতে পারে না।

(৪) যোগ্যতা। এটা এমন একটি শর্ত, যা প্রতিটি জিনিসে পেতে হয়। যোগ্যতা ছাড়া কোনো জিনিসই আইনত গ্রহণযোগ্য হয় না। অনেক আইনজ্ঞ যোগ্যতার জন্য বয়সের কন্ডিশনও আরোপ করেছেন। অর্থাৎ একুশ বছর, একুশ বছরের কম বয়সী লোক ক্রেডিট মানি দ্বারা লেনদেন করতে পারবে না, তবে আদালত যদি এখতিয়ার দেন তা হলে পারবে। যেমনটা আল জায়ীদ তাঁর রচিত গ্রন্থে উল্লেখ করেন–

واهل القانون يحددون سنا معينة للاهلية وهى احدى وعشرين سنة (احكام الاوراق النقدية للجعيد ٢٤٧)

অর্থাৎ আইনজ্ঞরা যোগ্যতার জন্য বয়সসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন আর তা হলো একুশ বছর।

(৫) ক্রেডিট মানির ওপর সইকারীর সই স্পষ্টভাবে থাকতে হবে।

(৬) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যার নামে সই করা হবে তার নাম ডকুমেন্টের ওপর লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

(৭) ক্রেডিট মানিতে উসুলকারীর নামও উল্লেখ থাকতে হবে।

(৮) ইস্যুর তারিখ ও স্থান উল্লেখ থাকতে হবে।

(৯) পরিশোধের তারিখ ও স্থান উল্লেখ থাকতে হবে।

(১০) টাকার সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ধারিত থাকতে হবে।

(১১) গ্রহণকৃত মালের মূল্যমান অথবা গ্রহণযোগ্য মালের মূল্যমান উল্লেখ থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, সাধারণত বিনিময় বিল বা হুন্ডি (Bill of exchange) এবং চেকের তিনটি পক্ষ থাকে। (ক) সইকারী (Drawer)। (খ) যার জন্য সই করা হয় (Drawee)। (গ) উসুলকারী (Payee) এবং বন্ডের দুটি পক্ষ হয়। ক. সইকারী (Drawer)। খ. যার জন্য সই করা হয় (Drawee) তাই বিনিময় বিল এবং চেককে আরবীতে ثلاثية الاطراف ত্রিপক্ষীয় এবং বন্ডকে ذو طرفين দ্বিপক্ষীয় বলা হয়।

ক্রেডিট মানিতে লেনদেন পদ্ধতি :

ক্রেডিট মানিতে লেনদেনের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো, এনডোরসকরণ (Endorsment) এনডোরসকরণ বলতে বোঝানো হয় স্থানান্তরযোগ্য ক্রেডিট মাধ্যম। অর্থাৎ চেক, অঙ্গীকার নামা, বিনিময় বিল ইত্যাদির টাকা উসুল করার জন্য কাউকে এখতিয়ার দিয়ে দেওয়া। ক্রেডিট মাধ্যম বিশেষত অঙ্গীকার নামা এবং বিনিময় বিলের পরিশোধের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেওয়া থাকে, যা আন্তদেশীয় ক্রেডিট মাধ্যমগুলোর ক্ষেত্রে কমপক্ষে এক মাস এবং ঊর্ধ্বে তিন মাস এবং বহিঃদেশীয় বিলগুলোর ক্ষেত্রে ছয় মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে। উক্ত সময়ের মধ্যেই ওই ক্রেডিট মাধ্যমগুলো হাতবদল হতে থাকে পর্যায়ক্রমে। তা সত্ত্বেও এর জন্য লিখিত এনডোরস করা থাকতে হয় এবং সেটা যথার্থ মনে করা হয় যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এর উপযুক্ত বিবেচ্য হয় এবং ওই সমস্ত শর্ত বিদ্যমান থাকে, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

এনডোরসমেন্টের (Endorsment) আইনগত চাহিদাসমূহ :

এনডোরসমেন্ট দ্বারা আইনগতভাবে নিম্নোক্ত চাহিদা পূরণ করা যায়।

(১) এনডোরসমেন্টকে বিনিময় বিলের ওপর সংযুক্ত করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে হস্তান্তরকারীর সইও যথেষ্ট মনে করা হয়।

(২) এনডোরসমেন্টের জন্য জরুরি হলো যে উক্ত বিল সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তরের জন্য হওয়া। অর্থাৎ বিলকে আংশিকভাবে কারো নিকট হস্তান্তর

করা যাবে না। এবং একটি বিলকে একই সময় একাধিক ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাবে না।

(৩) যদি বিল পরিশোধ করাটা দুই বা ততধিক ব্যক্তির নির্দেশের সাথে শর্তযুক্ত হয়। তাহলে এমতাবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে পরিশোধ করতে হবে।

(৪) যখন বিল নির্দেশ অনুসারে পরিশোধ যোগ্য হবে এবং এতে হস্তান্তরকারীর নাম ভুলে লেখা হয়েছে এমন হবে, তাহলে ওই ব্যক্তি অন্য কারো নামে হস্তান্তরের সময় ওই নামই লিখে দেবে, যা বিলের ওপর লেখা রয়েছে। তা সত্ত্বে ও এনডোরসমেন্টের সাথে নিজের সংশোধিত শুদ্ধ নামও লিখে দিতে পারে। সে বিলে উল্লিখিত নামের সত্যায়ন করারও অধিকার রাখে।

(৫) যদি বিল কয়েকবার এনডোরসমেন্টের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হচেছ এমন হয়, তাহলে হস্তান্তরের গুরুত্ব ও প্রকৃতি এর বিন্যাস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। যথা–একটি বিল ১ জানুয়ারি আনোয়ারের নামে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং একই বিল ৩ জানুয়ারি আকবরের নামে এবং আকবর একই বিল ৩০ জানুয়ারি হামেদের নামে করে দিল। এমতাবস্থায় আনোয়ার, আকবর এবং হামেদের হক বিলের ওপর বিন্যাস প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হবে।

এনডোরসমেন্টের (Endorsment) প্রকারসমূহ :

এনডোরসমেন্টকে নিম্নোক্ত সাত প্রকারে বিভক্ত করা যায়–

১. অলিখিত এনডোরসমেন্ট। বিলের অন্য পিঠে হস্তান্তরের অধিকারী ব্যক্তির শুধুমাত্র দস্তখত থাকবে। এ ধরনের এনডোরসমেন্ট যদি কোনো বিল উসুলকারী (Payee) অথবা হস্তান্তরকারীর (Endorsee) পক্ষ থেকে করা হয়, তাহলে উক্ত বিল একটি সাধারণ বিলের বাহকের মতো পরিশোধযোগ্য হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তিই পেশ করবে। সে তাকে আদায় করে দেবে।

(২) বিশেষ এনডোরসমেন্ট (Special Endorsment)

বিশেষ এনডোরসমেন্ট বলা হয়, যা ওই ব্যক্তির নামে বিশেষভাবে করে দেয়, যেই ব্যক্তি বা যার নির্দেশে বিল পরিশোধযোগ্য হয়। এ ধরনের এনডোরসমেন্টে হস্তান্তরকারী বিলের অন্য পিঠে নিজের দস্তখতের সাথে ওই ব্যক্তির নামও উল্লেখ করবে যে বা যার নির্দেশে উক্ত বিল পরিশোধযোগ্য হয়।

(৩) শর্তযুক্ত এনডোরসমেন্ট (Conditionel Endorsment)

শর্তযুক্ত এনডোরসমেন্ট পদ্ধতিতে বিল পরিশোধ কোনো শর্ত পূরণ হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করে দেওয়া হয়। যথা– আকরামকে এই বিলের টাকা আদায় করা হবে সে যদি বিল অব ল্যান্ডিং (Bill of Landing) হস্তান্তর করে। এর অর্থ হলো, আকরাম উক্ত বিল অব ল্যান্ডিং হস্তান্তর করলে বিলের টাকা উসুল করার অধিকারী হবে।

(৪) আংশিক এনডোরসমেন্ট (Partial Endorsment)

আংশিক এনডোরসমেন্টে বিলের সম্পূর্ণ টাকার কিছু অংশ অন্য কোনো ব্যক্তিকে আদায় করার জন্য বলা হয়। যথা–১০০০ টাকার এই বিলের মধ্য থেকে ৭০০ টাকা আকরামকে আদায় করা হবে। এমতাবস্থায় উক্ত বিলের ৭০০ টাকা পাওয়ার অধিকারী আকরাম তো হয়ে যায়; কিন্তু বিল তার নামে হস্তান্তর হতে পারে না।

(৫) নিয়ন্ত্রণপ্রবণ এনডোরসমেন্ট (Restrictive Endorsment)

এতে বিলের পরিশোধ বিশেষ কোনো ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। যথা–বিলের টাকা শুধু আকরামকেই দিতে হবে অথবা এই বিলের টাকা অমুক অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে।

(৬) নেতিবাচক এনডোরসমেন্ট (Negative Endorsment)

যখন হস্তান্তরকারী নিজের দস্তখতের সাথে এই শব্দগুলো সংযোজন করবে যে, অফেরত বা অপরিশোধের দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে না (Sans Recourse or Without Recourse to me) এ ধরনের হস্তান্তরে হস্তান্তরকারীর ওপর অতিরিক্ত দায়দায়িত্ব অর্পিত হয় না। যদি সে বিল খরচের (Sans No Charges) অথবা (Frains) শব্দ সংযোজন করে, তাহলে এর মাধ্যমে অন্যান্য খরচপাতির দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

(৭) এখতিয়ারমূলক এনডোরসমেন্ট (Facultative Endorsment)

এখতিয়ারমূলক এনডোরসমেন্ট হলো যাতে হস্তান্তরকারী নিজের সব অথবা কিছু অধিকার থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। যথা–কোনো ব্যক্তির নামে একটি বিল পরিশোধ না করার নোটিশ প্রত্যাহার করে নেওয়া এখতিয়ারমূলক এনডোরসমেন্ট।

(চলবে ইনশা আল্লাহ)

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-১৮

মুফতী ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

মুফতী তথা ফতওয়া দানকারীর জন্য যে সমস্ত বিষয় আবশ্যক :

গত ৯ নভেম্বর ২০০৪ সালে আম্মানে ইসলামী স্কলারদের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশের ২০০ স্কলারের নিকট তিনটি বিষয়ে তাদের ফতওয়া বা মতামত চাওয়া হয়। এ অধিবেশনে যে তিনটি প্রশ্ন করা হয়, তন্মধ্যে তৃতীয় প্রশ্নটি হলো,

من يجوز أن يعتبر مفتيا فى الإسلام؟ وما هى المؤهلات الأساسية لمن يتصدى للفتوى وهداية الناس الى أحكام الشريعة الإسلامية وتعريفهم بها؟

অর্থাৎ ইসলামে কে মুফতী হতে পারবেন? এবং মৌলিক কী কী বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করলে কেউ মানুষকে শরীয়তের বিধিবিধানের ব্যাপারে নির্দেশনা ও ফতওয়া প্রদানে সক্ষম হবে?

এ প্রশ্ন প্রসঙ্গে জেদ্দাস্থ ওআইসির ইসলামিক ফিকহ একাডেমি যে উত্তর প্রদান করেছে, সেটি নিচে উল্লেখ করা হলো–

وله مكانة عالية مهمة، فهو وارث علم النبى(ص)، وموقّع عن رب العالمين(عزوجل)، يبين أحكامه ويطبقها على أفعال الناس؛ لأنه يعتبر من أهل الذكر الذين أمر الله بالرجوع إليهم حيث قال جل شأنه : (فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).

ولما كانت للمفتى هذه المكانة وتلك المنزلة اشترط العلماء فيمن يتعرض للإفتاء أن تتوافر فيه شروط المجتهد، وأن يتصف بصفات ويتخلق بآداب منها مايلى:

'ইসলামে মুফতীর গুরুত্ব অপরিসীম। সে হলো রাসূল (সা.)-এর ইলমের উত্তরসূরি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত প্রতিনিধি। সে আল্লাহর বিধিবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং সেটিকে মানুষের অবস্থা ও কাজের জন্য আমলযোগ্য করে তোলে। মুফতীকে 'আহলুয যিকির'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাদের নিকট জিজ্ঞাসার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

'জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তোমাদের জানা না থাকে।'

মুফতীর সুউচ্চ মর্যাদা ও গুরুত্বের কারণে উলামায়ে কেরাম মুফতীর মাঝে মুজতাহিদের শর্তসমূহের উপস্থিতিকে অপরিহার্য করেছেন এবং তাঁর মাঝে নিম্নবর্ণিত গুণাবলি থাকা আবশ্যক–

এক.

أولاً :أن يكون مسلماً، مكلفاً، عدلاً، ثقة، مأموناً، ورعاً، تقياً، غير مبتدع فى الدين، متنزهاً عن أسباب الفسق ومسقطات المروء ة :لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد، وخبر الفاسق لا يقبل.

'মুসলমান, মুকাল্লাফ (বালেগ ও বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া), ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত (সিকাহ), আমানতদার, পরহেযগার, মুত্তাকী হওয়া। এবং দ্বীনি বিষয়ে বিদ'আতী না হওয়া, পাপাচার ও অশালীন কাজ থেকে বিরত থাকা, অর্থাৎ ফাসেক ও অসভ্য না হওয়া। কেননা কারও মাঝে যদি উল্লিখিত শর্তগুলো না থাকে, তবে কোনোভাবেই তার কথা নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা ইসলামে ফাসেকের কোনো বক্তব্যও গ্রহণযোগ্য নয়।?

দুই.

ثانياً :أن لا يكون متساهلا فى فتواه، لأن من عرف بالتساهل فيها لم يجز أن يُستفتى، ولأن من واجب المفتى أن لا يدلى برأيه إلا بعد استيفاء الموضوع حقه من النظر والدرس . ورد فى سنن الدارمى مرفوعا ، قال رسول الله(ص) :(أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار.

ফতওয়ার ব্যাপারে বেপরোয়া এবং উদাসীন না হওয়া। কেননা যে ফতওয়ার ব্যাপারে বেপরোয়া, তার কাছে ফতওয়া চাওয়া জায়েয নয়। কেননা মুফতীর জন্য আবশ্যক হলো যে সে বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ অধ্যয়ন ও সম্যক ধারণা লাভের পূর্বে কোনো ফতওয়া প্রদানে অগ্রসর হবে না। রাসূল (সা.)-এর হাদীসে রয়েছে, 'তোমাদের মাঝে যে ফতওয়া প্রদানে সাহস দেখাল, সে যেন জাহান্নামের

ব্যাপারে দুঃসাহস দেখাল।'

তিন.

ثالثاً :أن يكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صريح القول، واضح العبارة، صحيح التصرف والاستنباط، فطنا مدركا لوقائع الأمور فى شتى نواحى الحياة.

'প্রত্যুৎপন্ন ফকীহ হওয়া। সাথে সাথে সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন সঠিক চিন্তাধারার অধিকারী এবং দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্টভাষী হওয়া। মাসআলা আহরণ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে যথার্থ পদ্ধতি অনুসরণ করা। জীবনের বিভিন্ন দিক এবং বিভিন্ন ঘটনা গভীর ও তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করা।'

رابعاً :أن يكون عارفا باللغة العربية، وموارد الكلام ومصادرها بما يمكنه من فهم مراد الله عزوجل ومراد رسوله(ص) فى خطابيهما، فإن اللغة العربية هى الذريعة لمدارك الشريعة.

চার.

আরবী ভাষা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হওয়া। এবং আরবী ভাষার প্রয়োগক্ষেত্র ও তার উৎস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া; যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর বক্তব্য ও বাচনশৈলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। কেননা শরীয়তকে সঠিকভাবে আয়ত্ত করার মাধ্যম হলো আরবী ভাষা।

পাঁচ.

خامساً :العلم بكتاب الله على الوجه الذى تتضح به معرفة ما تضمنه من الأحكام؛ من محكم، ومتشابه، وعموم، وخصوص ومجمل، ومفسر، وناسخ، ومنسوخ.

'পবিত্র কোরআনের ওপর এই পরিমাণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করা, যার মাধ্যমে কোরআনে বর্ণিত বিধিবিধানসমূহ সম্পর্কে অবগত হতে পারে। অর্থাৎ কোরআনের মুহকাম, মোতাশাবেহ, আম, খাস, মুজমাল, মুফাসসার এবং নাসেখ-মানসুখ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা।

ছয়.

سادساً :العلم بسنة رسول الله(ص) الثابتة من أقواله، وأفعاله، وطرق ورودها من التواتر والآحاد والصحة والفساد، وحال الرواة، من تعديل وتجريح.

'রাসূল (সা.)-এর প্রমাণিত সুন্নাহের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত বিষয়সমূহ, তাঁর কাজ ও বক্তব্য এবং এগুলো বর্ণনার পরম্পরা সম্পর্কে অবগত হওয়া। অর্থাৎ কোন হাদীসটি মুতাওয়াতির, কোনটি খবরে ওয়াহেদ, কোনটি সহীহ কিংবা যয়ীফ সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা। সাথে সাথে বর্ণনাকারীদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা।'

সাত.

سابعا :معرفة مذاهب الفقهاء المتقدمين فيما أجمعوا عليه، واختلفوا فيه، ليتبع الأحكام ، ولا يفتى بخلاف ما أجمعوا عليه، ويجتهد رأيه فيما اختلفوا فيه.

'পূর্ববর্তী ফকীহগণের মাযহাব সম্পর্কে অবগত হওয়া। অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ে তাঁদের মাঝে ইজমা হয়েছে এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁরা মতপার্থক্য করেছেন, সেগুলোর ব্যাপারে অবগত থাকা; যেন এর আলোকে সে ফতওয়া দিতে পারে এবং ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়ের বিপরীত সে কোনো ফতওয়া দেবে না এবং মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সে ইজতেহাদ করবে।'

আট.

ثامناً :معرفة القياس وطرق العلة والاجتهاد؛ ليرد الفروع الى اصولها، ويجد الطريق الى العلم بأحكام النوازل.

'কিয়াস, ইল্লত ও ইজতেহাদের পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া। যেন শাখাগত মাসআলা-মাসায়েল ও উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে মৌলিক উৎসের আলোকে এর সমাধান দিতে পারে।'

নয়.

تاسعاً :أن يكون متأدبا بالآداب التى رسمها الفقهاء لمن يمارس الإفتاء ، ومنها :أن لا يفتى وهو فى غضب أو خوف أو جوع أو شغل قلب أو مدافعة للأخبثين لئلا يخرج عن حالة الاعتدال وكمال التثبت، وأن يتحرى الحكم بما يرضى ربه، ويجعل نصب عينيه قوله تعالى : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتّبع أهواء هم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك .(٥))

'মুফতীর জন্য যে সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আদব অর্জন আবশ্যক, সেগুলো অর্জন করা। অর্থাৎ

১. ক্রোধ, ভয়, ক্ষুধা, মানসিক চিন্তা, প্রাকৃতিক চাহিদা থাকা অবস্থায় সে কোনো ফতওয়া প্রদান করবে না; যেন সে পূর্ণ স্থিরতা ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা থেকে বিচ্যুত না হয়। এবং বিধিবিধান আহরণে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ রাখা এবং তার দৃষ্টি থাকবে পবিত্র কোরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতের দিকে–

وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتّبع أهواء هم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك

'আর আমি আদেশ করছি যে আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাজিল করেছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না' [সূরা মায়েদা, আয়াত নং ৪৯]

وأن لا يفتى بالحيل المحرمة أو المكروهة، وأن لا يبتغى بفتواه مصالح دنيوية من جر مغنم أو دفع مغرم، وأن لا يحابى فى فتواه فيفتى بالرخص من أراد نفعه .

২. হারাম বা মাকরূহ হিলার মাধ্যমে কোনো ফতওয়া প্রদান না করা। মুফতী ফতওয়ার ক্ষেত্রে পার্থিব কোনো কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। এবং এ ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করবে না অর্থাৎ কারো উপকারের লক্ষ্যে শিথিল বিষয়ের ওপর ফতওয়া প্রদান করবে না।

وأن يكون متهيبا للإفتاء ، لا يتجرأ عليه إلا حيث يكون الحكم جليا واضحا، أما فيما عدا ذلك فعليه أن يتثبت ويتريث حتى يتضح له وجه الجواب، فإن لم يتضح له الجواب وأفتى يكون قد أفتى بغير علم، والإفتاء بغير علم كذب على الله ورسوله وكبيرة من الكبائر، لقوله تعالى :(قل إنّما حرّم ربّى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) .ومن أجل ذلك كثر النقل عن السلف إذا سئل أحدهم عما لا يعلم أن يقول للسائل :لا أدرى.

৩. 'ফতওয়ার ব্যাপারে যারপরনাই সতর্ক হওয়া এবং কোনো হুকুম সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন না হওয়া পর্যন্ত কোনো ফতওয়া প্রদান করবে না। নতুবা তার জন্য এ বিষয়ে পূর্ণ অনুসন্ধান ও স্থিরতা আবশ্যক, যতক্ষণ না বিষয়টি তার নিকট পূর্ণ বিকশিত না হয়। বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পূর্বেই যদি সে ফতওয়া প্রদান করে, তবে সে অজ্ঞতাবশত ফতওয়া দিল। আর অজ্ঞতাবশত ফতওয়া প্রদান হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর ওপর মিথ্যারোপ করা এবং বড় বড় কবীরা গোনাহের অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

'আপনি বলে দিন : আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না।'

এ জন্য পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম থেকে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত আছে যে যখন তাদের অজানা কোনো বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তখন তারা বলে দিয়েছে 'আমি জানি না।

أن يكون دارسا للفقه دراسة واسعة، متسماً بالاعتدال والوسطية، متمرسا فى فهم مسائل الفقه المذكورة فى الكتب، ويكون ذا باع فى دراسة قضايا الفقه الجزئية.

৪. ফিকহ শাস্ত্রে ব্যাপক ও দীর্ঘ অধ্যয়ন করা এবং মধ্যম পন্থা ও ভারসাম্যের ওপর অটল থাকা। ফিকহের কিতাবসমূহে লিখিত মাসআলা-মাসায়েল অনুশীলন করা এবং শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের সমাধান প্রদানে সিদ্ধহস্ত হওয়া।

وأن يكون محيطاً بأكثر ما صدر من فتاوى وأحكام فى موضوع فتواه، معتمداً على ما كتبه المحققون من الفقهاء والمفتين .وعليه أن يأخذ بما يترجح لديه من أحكام بالشروط المعتبرة فى الاجتهاد الفقهى، بحسب الدليل دون الأخذ بالأقوال الضعيفة غير المعتبرة أو الشاذة.

৫. ফতওয়া প্রদান করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত ফতওয়াসমূহ

সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা। এবং এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মুফতী এবং বিশ্লেষক আলেমগণের লিখিত ফতওয়ার কিতাবসমূহের ওপর নির্ভর করা। ফিকহ শাস্ত্রে ইজতেহাদের শর্ত অনুযায়ী দলিলের আলোকে কোনো মাসআলাকে প্রাধান্য দিয়ে সেটা গ্রহণ করা বৈধ হবে; কিন্তু তার পক্ষে কোনো দুর্বল কিংবা কোনো বিরল বক্তব্য গ্রহণ করা বৈধ নয়।

وأن يراعى المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية والفروق بين المسائل الجزئية، كما يراعى المآلات.أن يكون عارفاً بالكتب المعتمدة فى المذاهب الفقهية ومصطلحاتها، فهى مفاتيح لفهم النصوص الفقهية.

৬. মাকাসেদে শরইয়্যাহ তথা শরীয়তের চাহিদা ও উদ্দেশ্য, ফিকহের মূলনীতিসমূহ এবং বিভিন্ন মাসআলার মাঝে মৌলিক তারতম্যের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া। ফিকহ শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্য কিতাবসমূহ এবং ফিকহের পরিভাষা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। কেননা এগুলো হলো, ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়নের মূল চাবিকাঠি।

والحرص على الالتزام بهذا وتطبيقه فى السير على المنهج الإلهى وحماية المؤمنين من الحرج والخطأ فيما يصدر عن غير المفتيين المتثبتين هو القصد الأساسى من كل هذه الشروط.

উপরোক্ত বিষয়গুলো অর্জন করে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী সেগুলো বাস্তবায়ন করা। মুসলমানদেরকে বিভিন্ন সমস্যা ও অপরিণামদর্শী কথিত বিশ্লেষকদের ভ্রান্ত মতবাদ থেকে রক্ষা করা। আর এটাই উপরোল্লিখিত শর্তগুলোর মূল উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞ পাঠক! এখন চিন্তা করুন ইসলামের মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা ও ফতওয়া দেওয়ার যোগ্য কারা হতে পারে? ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, প্রফেসররা যদি ফতওয়া দিয়ে বেড়ান তাহলে ইসলামের কী অবস্থা হবে? হ্যাঁ, তাঁরাও যদি সনদের সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইসলামী ইলম অর্জন করেন সেটা ভিন্ন কথা। কোনো কিতাব মুতালা'আ/অধ্যায়ন করেই যদি কেউ নিজেকে ফতওয়া দেওয়ার যোগ্য মনে করে এবং ফতওয়া দিতে থাকে–তা পুরো মুসলিম উম্মাহের অধঃপতনকেই তরান্বিত করবে।

(চলবে ইনশা আল্লাহ)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মাও. আ. গফুর
গুরাবী, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের গ্রামে ছোট একটি মসজিদ রয়েছে, যার তিন দিকেই কবরস্থান। মসজিদটি খুব ছোট হওয়ার কারণে এলাকার সকল লোক সেখানে নামায পড়তে পারে না। কাছেই মাদরাসা, মাদরাসার মসজিদ অনেক বড় (নতুন করা হয়েছে)। এলাকার অধিকাংশ লোক কবরস্থানের ছোট মসজিদ বাদ দিয়ে মাদরাসা মসজিদে নামায পড়তে চায় এবং ছোট মসজিদটিকে ইসলামী পাঠাগার বা ভেঙে কবরস্থান বানানোর পরিকল্পনা করে। জানার বিষয় হলো, কবরস্থানের ছোট মসজিদটি চিরতরে বাদ দেওয়া ও সবাই মাদরাসা মসজিদে নামায পড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া কতটুকু শরীয়তসম্মত? যদি তাদের সিদ্ধান্ত সঠিক হয় তাহলে ছোট মসজিদকে ইসলামী পাঠাগার বা কবরস্থানে রূপান্তরিত করা যাবে কি না? অন্যথায় মসজিদের হেফাজতের পদ্ধতি কী হবে?

সমাধান :

শরীয়তের বিধান মতে, কোনো স্থানে একবার শরয়ী মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ওই স্থান কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে যায়। বিধায় এটিকে ইসলামী পাঠাগার কিংবা কবরস্থানে রূপান্তরিত করা কোনো অবস্থাতেই জায়েয হবে না। অতএব প্রশ্নোক্ত মসজিদটি কিছু মুসল্লি দ্বারা হলেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে আবাদ রাখা এলাকাবাসীর ঈমানী দায়িত্ব। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৭৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৪২৭)

প্রসঙ্গ : সুদ

মুহা. আব্দুস সালাম
বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক ব্যক্তি ব্যাংক থেকে পাওয়া সুদের টাকা দিয়ে মাদরাসার টয়লেট নির্মাণ করে দিতে চায়। জানার বিষয় হলো, সুদের এই টাকা দিয়ে মাদরাসার টয়লেট নির্মাণ করা যাবে কি না?

সমাধান :

সুদের টাকা দিয়ে মাদরাসার টয়লেট নির্মাণ করা যাবে না এবং উক্ত টাকা সাওয়াবের নিয়্যাত ব্যতীত দায়মুক্তির লক্ষ্যে অসহায় গরিব-মিসকিনকে দিয়ে দিতে হবে। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩৮৫)

প্রসঙ্গ : সিজদায়ে শোকর

হাফেজ আবু বকর সিরাজী
রানীগ্রাম, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা-১

সিজদায়ে শোকর করার জন্য অজু থাকা আবশ্যক কি না? যদি কেউ অজু ছাড়া সিজদায়ে শোকর করে তবে তার বিধান কী?

সমাধান-১

সিজদায়ে শোকরের জন্য অজু থাকা আবশ্যক বিধায় অজু ছাড়া সিজদায়ে শোকর করলে তা আদায় হবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/১১৯)

জিজ্ঞাসা-২

বিভিন্ন খেলায় দেখা যায় কোনো খেলোয়াড় ভালো খেলার পর সিজদায়ে শোকর করে থাকে। এ ধরনের সিজদায়ে শোকরের বিধান কী? এবং তার ঈমানে কোনো ত্রুটি আসবে কি না?

সমাধান-২

বর্তমানে প্রচলিত খেলাধুলার মতো গোনাহের কাজে ভালো কিছু করতে পেরে আল্লাহর শোকরিয়াস্বরূপ সিজদা করা ইবাদতের সাথে ঠাট্টা করার নামান্তর, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। এতে ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। (রদ্দুল মুহতার ১/৯)

প্রসঙ্গ : সমিতি

মুহা. আবুল কালাম জাহেদী
সদর, সিলেট।

জিজ্ঞাসা :

আমি একজন ব্যবসায়ী। আমাদের মার্কেটের কয়েকজন ব্যবসায়ী

একত্রিত হয়ে একটি সমিতি করেছি, যার নিয়ম হলো, সকলে প্রতিদিন ১০০ টাকা করে জমা দেয় এবং মাস শেষে সবার নামে লটারি করা হয়। যার নাম ওঠে তিনি একসাথে ৩০,০০০ টাকা নিয়ে নেন। এরই ধারাবাহিকতায় একের পর এক সবাই একবার করে টাকা পাওয়ার পর পুনরায় প্রথম থেকে লটারি করা হয়। উল্লেখ্য, যাঁর নাম লটারিতে ওঠে তিনি রীতিমতো প্রতিদিনের টাকা জমা দিতে থাকেন। এভাবে টাকা জমা করলে একসাথে বেশ কিছু টাকা আমাদের হস্তগত হয়। কিন্তু স্থানীয় একজন মুফতী সাহেব আমাদের টাকা জমা রাখার এই পদ্ধতিকে জুয়া আখ্যায়িত করে হারাম বলেছেন। আমি এ ব্যাপারে শরয়ী সমাধান কামনা করছি?

সমাধান :

জুয়া বলা হয় যেখানে লাভ-ক্ষতি ও একে-অপরের মাল নিয়ে নেওয়ার আশঙ্কা থাকে। প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে লাভ-ক্ষতির আশঙ্কা নেই। সময়ের ব্যবধানে প্রত্যেকে তার আসল টাকা পাচ্ছে। তাই একে জুয়া বলা যাবে না। পরস্পর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। (রদ্দুল মুহতার ৬/৪০৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২১৭)

প্রসঙ্গ : মসজিদ/মাদরাসা

মুহা. মিজানুর রহমান
পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণের জন্য ২ শতাংশ জমি ওয়াক্‌ফ করেন। অতঃপর আরো ২ শতাংশ মাদরাসা নির্মাণের জন্য ওয়াক্‌ফ করেন। কিন্তু মসজিদ ও মাদরাসার জন্য উক্ত জায়গা যথেষ্ট না হওয়ায় জমি দাতাসহ কমিটি পক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে উক্ত ৪ শতাংশে ১০ তলাবিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ করে নিচের তিনতলা মসজিদের কাজে ব্যবহৃত হবে। আর অবশিষ্ট সাততলা মাদরাসার কাজে ব্যবহৃত হবে। জানার বিষয় হলো, তাদের এ সিদ্ধান্ত কতটুকু শরীয়তসম্মত? তাদের করণীয় কী?

সমাধান :

মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত ২ শতাংশ জায়গায় মাদরাসার ভবন করা যাবে না। বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মাদরাসা-মসজিদের যৌথ ভবন নির্মাণ বৈধ নয়। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৭৯, ফাতাওয়া দারুল উলুম ১৩/৩১৭)

প্রসঙ্গ : মোবাইল ফোনে বিয়ে

মুহা. মাহফুজুর রহমান
মৌলভীবাজার, সিলেট।

জিজ্ঞাসা :

আমার একজন নিকটাত্মীয় লন্ডনে বসবাস করেন। কয়েক দিন আগে তিনি বাংলাদেশে অবস্থানরত একজন মেয়েকে বিবাহ করেন। বিয়ের দিন স্ত্রী বরের বাড়িতে চলে আসেন। এবং কাজি সাহেবকে নিজের উকিল বানিয়ে বিবাহ পড়ানোর অনুমতি দেন। কাজি সাহেব তখনই স্কাইপি তথা ভিডিও কলের মাধ্যমে লন্ডনে অবস্থানরত বরের সাথে বিবাহ পড়িয়ে দেন। উল্লেখ্য যে ভিডিও কলের মাধ্যমে বর-কনে একে-অপরকে পরিষ্কারভাবে দেখেছেন। উভয় দেশে বর-কনের আত্মীয়স্বজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও বিবাহের মজলিসে উপস্থিত থেকে বর-কনের বিবাহ সংগঠিত হওয়া প্রত্যক্ষ করেছেন। বর্তমানে বর-কনের মধ্যে অডিও-ভিডিও কথাবার্তা হচ্ছে, কিন্তু এখনও তাদের মাঝে সরাসরি সাক্ষাৎ হয়নি। জানার বিষয় হলো, তাঁদের উক্ত বিবাহ সহীহ হয়েছে কি না? সহীহ না হলে এখন তাঁদের উভয়ের জন্য করণীয় কী? ভিডিও কলের মাধ্যমে সরাসরি বিবাহ সহীহ হওয়ার সঠিক পদ্ধতি কী হতে পারে?

সমাধান :

বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিয়ের ইজাব কবুল সাক্ষীদের সামনে একই মজলিসে হওয়া শর্ত। তাই প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে তাঁদের বিবাহ সঠিক হয়নি। পুনরায় বিবাহ পড়াতে হবে। যার সঠিক পদ্ধতি হলো, প্রবাসে অবস্থানরত বর মোবাইলের মাধ্যমে কাউকে তাঁর বিবাহের উকিল নিযুক্ত করবেন। অতঃপর বিবাহের মজলিসে বরের উকিল সাক্ষীদের সামনে নিজ মক্কেলের পক্ষ থেকে কবুল পড়বেন, অর্থাৎ বিবাহের প্রস্তাবের উত্তরে এভাবে বলবেন যে অমুকের পক্ষ থেকে আমি কবুল করলাম। (আদ্দুররুল মুখতার ১/১৮৬, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১১/১৬২)

প্রসঙ্গ : কবর যিয়ালত

মুহা. দিলাওয়ার হুসাইন
সদর, ফেনী।

জিজ্ঞাসা :

মৃত মানুষের কবরের পাশে কোরআন

শরীফ নিয়ে গিয়ে ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যাতে তিলাওয়াত করা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কতটুকু বৈধ?

সমাধান :

কবরের পাশে কোরআন শরীফ নিয়ে গিয়ে কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়া ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যাতে তিলাওয়াত করা বৈধ হলেও বর্তমানে তা বিদ'আতীদের বৈশিষ্ট্য এবং এতে যেকোনো স্থান থেকে সাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছেনা মনে করার মতো ভ্রান্ত আক্বিদা জন্ম নেওয়ার আশঙ্কা আছে বিধায় তা বর্জনীয়। (রদ্দুল মুহতার ২/২৪২, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৬/২১)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

মুহা. আজিজুল্লাহ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমার রেজামন্দী না থাকা সত্ত্বেও পরিবার এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কর্তৃক মানসিক চাপ সৃষ্টির কারণে বাধ্য হয়ে বিবাহ করেছি। এবং স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপনও করেছি; কিন্তু তার সাথে আমার দৈহিক মিলন হয়নি। এমতাবস্থায় যদি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিই তাহলে তাকে মোহর দিতে হবে কি না? যদি দিতে হয় তাহলে কত টাকা দিতে হবে? বিবাহের মোহর ছিল ৭০ হাজার টাকা।

সমাধান :

তালাক আল্লাহ তা'আলার কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। লোক সমাজেও তা নিন্দনীয়। শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া গোনাহ। তাই অযথা তালাকের ইচ্ছা পোষণ করে থাকলে তা পরিবর্তন করুন। এতদসত্ত্বেও প্রশ্নে বর্ণিত স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হলে পূর্ণ মোহরানা আদায় করতে হবে। (বাদায়িউস সানায়ে ২/২৯১, ফাতাওয়া রহিমিয়া ৬/৪৪৩)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুফতী আব্দুস সালাম
বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় একটি জায়গা দীর্ঘদিন ধরে অনাবাদ অবস্থায় পড়ে আছে। ফলে এলাকার লোকজন সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলে স্তূপ করে রাখত। উল্লেখ্য, ওই জমির আসল মালিক মারা গেছেন। এখন তাঁর সন্তানরাই তাঁর ওয়ারিশ বা হকদার। কিন্তু তারা ওই জায়গাটি নিজেদের আয়ত্তে নিতে পারছিল না। বিধায় তারা এলাকার কমিশনার ও সর্দারের সহযোগিতা নিয়ে তা পরিষ্কার করে তাতে মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এদিকে ওই জায়গার সাথেই দেয়ালঘেঁষে পত্রিকা সাংবাদিকদের জায়গা। তাঁরা ওই কমিশনার সাহেবকে বলেন যে আপনারা ওই জায়গায় আমাদের অফিসের জন্য কিছু জমি ছেড়ে দেন। এবং বাকি জায়গায় আপনারা মসজিদ নির্মাণ করেন। এখন কমিশনার সাহেব এ ব্যাপারে একদম চুপ আছেন। এবং কোনো রকম পদক্ষেপই নিচ্ছেন না। প্রকাশ থাকে যে ওই এলাকার লোকদের নামাযের জন্য নিকটবর্তী কোনো মসজিদ নেই। বিধায় এখানে একটি মসজিদ একান্ত প্রয়োজন। তাই এখন জানার বিষয় হলো, ওই জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নোক্ত জমির মালিক মারা যাওয়ার পর তাঁর প্রকৃত ওয়ারিশদের সম্মতিতে উক্ত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ হবে। তবে তাদের মধ্যে কোনো নাবালেগ কিংবা পাগল থাকলে তাদের হক আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। (ফাতাওয়া কাযিখান ৪/৩৪, বাদায়িউস সানায়ে ৬/২১৯)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহা. ফজর আলী
জুরাইন, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামায কাযা করলে কোরআন ও হাদীসে তার কী পরিমাণ শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। অনেকের মুখ থেকে শোনা যায় যে এক ওয়াক্ত নামায ইচ্ছাকৃতভাবে কাযা করলে দুই কোটি আটাশি লক্ষ বছর দোযখের আগুনে জ্বলতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো হাদীস আছে কি না?

সমাধান :

ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে নামায। নামাযই ঈমানদার ও বেঈমানদের মাঝে বিশেষ পার্থক্যে ভূমিকা রাখে। শরয়ী কোনো কারণ ছাড়া অলসতাবশত ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কোরআন ও হাদীসে এর প্রতি পরকালীন কঠিন

শাস্তি ও অশুভ পরিণতির ঘোষণা এসেছে। সাথে সাথে এ নামাযগুলো কাযা করা ও স্বীয় কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করার প্রতিও তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। তবে ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগকারীর ব্যাপারে যে শাস্তির কথা প্রশ্নে বলা হয়েছে তা হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহা. খয়বর হোসেন
চাটমোহর, পাবনা।

জিজ্ঞাসা :

আমরা একটি জামে মসজিদের নিয়মিত মুসল্লি। দুটি বিষয়ে আপনার নিকট আমাদের প্রশ্ন–আশা করি, কোরআন- হাদীস ও ফিকহের আলোকে এর সমাধান দেবেন।

প্রথম প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের নিজস্ব কিছু সম্পত্তি আছে। তা থেকে যা আয় হয় তাতে মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন ও খাদেমসহ রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব। মসজিদসংলগ্ন একটি মাদরাসা আছে, যা পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান কমিটি মসজিদের কাজ না করে মসজিদের টাকা মাদরাসায় ব্যবহার করেন। যে কারণে মসজিদের অবস্থা অবহেলিত এবং মুসল্লিরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। মসজিদটি তাবলীগের মারকাজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়; যার কারণে মসজিদে মুসল্লিদের সমাগম বেশি। মসজিদের কাজ করা দরকার। কিন্তু মসজিদে কোনো কাজ না করে মসজিদের টাকা মাদরাসায় ব্যবহার করা জায়েয আছে কি? প্রকাশ থাকে যে মসজিদের ফান্ডে যে টাকা আয় হয় তাতে মসজিদ পরিচালনা করতে কোনো অসুবিধা হয় না। এর পরও কমিটি কর্তৃক মসজিদের উত্তর পাশে জানালা এবং সানসেট বন্ধ করে একটি দোকান নির্মাণ করেছে। ফলে মসজিদের সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে। এ কাজ করা জায়েয হবে কি না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : মসজিদের ইমাম সাহেব একজন মেয়ের সাথে মোবাইল ফোনে অশালীন ন্যক্কারজনক কথোপকথন করেন, যা বিভিন্নজনের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। মোবাইলের কথোপকথন ইমাম সাহেবের কণ্ঠ বলে অধিকাংশের ধারণা। এতে করে মুসল্লিরা বিব্রত অবস্থায় পড়েছে। অনেকেই ইমামের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে অন্য মসজিদে নামায পড়ছে। এমতাবস্থায় ইমামের ইমামতি করা জায়েয হবে কি না? অতএব হুজুরের নিকট আবেদন–এই বিষয় দুটি কোরআন-হাদীস এবং ফিকহের আলোকে দলিল ও হাওয়ালা সহকারে উত্তর দিতে আপনার মর্জি হয়।

সমাধান : ১

প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী মসজিদের ফান্ডের টাকা মাদরাসায় খরচ করা বৈধ নয় বরং ওই টাকা দিয়ে মসজিদের উন্নয়নমূলক কাজ করাই মসজিদ কমিটির দায়িত্ব। আর মসজিদের জানালা এবং সানসেট বন্ধ করে দোকান বানানোয় যদি মসজিদের পরিবেশ নষ্ট না হয় এবং দোকানের দেয়াল ভিন্ন হয় তাহলে তা জায়েয হলে ও মসজিদের সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ায় অনুচিত। (রদ্দুল মুহতার ৪/৩৬৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/১৬৭)

সমাধান : ২

নিশ্চিত না হয়ে শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা নাজায়েয। (সহীহ মুসলিম ২/৩১৬, মা'আরিফুল কুরআন ৮/১২০)

প্রসঙ্গ : তারাবীহ

মুহা. আলমগীর হুসাইন
লক্ষ্মীপাশা, নড়াইল।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকার মসজিদে হাফেজ সাহেবগণ খতমে তারাবীহ পড়ানোর সময় দশ রাক'আত করে পড়ান, কিন্তু জনৈক ইমাম সাহেব বলেন, তারাবীহর প্রত্যেক তারবীহাহ্ যেহেতু চার রাক'আত করে তাই এভাবে দশ রাক'আত করে পড়ানো সঠিক নয়। আট রাক'আত বারো রাক'আত করে পড়ানো সুন্নাত। এখন আমার জানার বিষয় হলো উক্ত ইমাম সাহেবের কথা কতটুকু সঠিক এবং এ ব্যাপারে আসল নিয়ম কী? জানিয়ে উপকৃত করবেন।

সমাধান :

তারাবীর নামায আদায়ের ক্ষেত্রে উত্তম হলো এক ইমামই পুরো বিশ রাক'আত পড়াবেন। যদি একাধিক ইমাম পড়ান, তাহলে মুস্তাহাব হলো পুরো তারবীহাহ্ (চার রাক'আত) শেষ করে ইমাম পরিবর্তন হওয়া। এ হিসেবে দশ রাক'আতের পর হাফেজ সাহেবগণ পরিবর্তন হওয়া জায়েয হলেও তা অনুত্তম, আর আট বা বারো রাক'আতের পর পরিবর্তন হওয়া উত্তম। (ফাতওয়া হিন্দিয়া

১/১১৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৬৪)

প্রসঙ্গ : দ্বিতীয় জামা'আত

আ. রহিম
বরগুনা।

জিজ্ঞাসা :

জুমু'আর মসজিদ যেখানে ইমাম-মোয়াজ্জিন নিযুক্ত আছেন এবং সময়মতো নামায আদায় করা হয় ওই মসজিদে দ্বিতীয় জামা'আত করা যাবে কি না? এবং মুসাফিরের জন্য জায়েয হবে কি না? ইমাম সাহেবের নির্ধারিত নামাযের স্থান হতে সরে অন্য স্থানে দ্বিতীয় জামা'আত করা যাবে কি না? মসজিদের বারান্দায় দ্বিতীয় জামা'আত করা যাবে কি না?

সমাধান :

যে মসজিদে ইমাম-মোয়াজ্জিন নির্ধারিত আছেন সে মসজিদের মুসল্লিগণ আযান ইকামতের সহিত জামা'আতে নামায আদায় করলে, অন্য লোকদের জন্য উক্ত মসজিদের যেকোনো অংশে দ্বিতীয় জামা'আত করা মাকরূহ। তবে মুসাফিরের জন্য দ্বিতীয় জামা'আত করার অনুমতি আছে। (হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদিন ১/৫৫৩, ইমদাদুল আহকাম ১/৫১৮)

প্রসঙ্গ : বীমা

মুহা. আব্দুর রহমান ভূঁইয়া
বদরপুর, ফরিদপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী লন্ডনভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় প্রায় সাড়ে ৪ বছর যাবত কাজ করছি। এপ্রিল ১৫ থেকে সংস্থা কর্তৃক আমাকে একটি গ্রুপ বীমা পলিসির আওতায় আনতে চাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আমার নিয়োগকারী সংস্থা আমার অন্য কলিগদের সাথে আমার নামে সংস্থার তহবিল থেকে বীমা কোম্পানিতে একটি নির্দিষ্ট অংকের প্রিমিয়াম প্রতিবছর ১ বার জমা দিতে হয়। বিনিময়ে বীমা কোম্পানি আমাকে দুটি সুবিধা দেবে। যার প্রথমটি হচ্ছে, আমি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট বা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে যদি হাসপাতালে ভর্তি হই এবং হাসপাতাল বিল যদি ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বা তার বেশি হয় তবে উক্ত বীমা কোম্পানি আমাকে সর্বোচ্চ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত (প্রতি ৬ মাসে ১ বার) চিকিৎসা সুবিধা দেবে। আর যদি হাসপাতাল বিল ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার কম হয় তবে উক্ত বীমা কোম্পানি আমাকে খরচকৃত বিলের সমপরিমাণ টাকা চিকিৎসা সুবিধা দেবে। দ্বিতীয়ত, যদি আমি অফিসের কোনো কাজে বের হয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যাই তখন বীমা কোম্পানি আমার এক মাসের মূল বেতনের ৩৬ গুণ টাকা আমার নমিনিকে জীবন বীমা হিসেবে পরিশোধ করবে। উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে আপনার কাছে আমার সবিনয় প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের বীমা সুবিধা নেওয়া মুসলিম শরীয়াহ অনুযায়ী জায়েয হবে কি? যদি জায়েয না হয় তবে উপযুক্ত শরয়ী ব্যাখ্যা দিতে পারলে আমি উক্ত গ্রুপ বীমা থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। দয়া করে লিখে জানালে উপকৃত হব।

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত গ্রুপ বীমাতে সুদ এবং জুয়া বিদ্যমান থাকায় তা নাজায়েয ও হারাম। অতএব ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত গ্রুপ বীমা থেকে জমাকৃত মূল টাকা ব্যতীত অন্য কোনো সুবিধা গ্রহণ করা বৈধ হবে না। (আহকামুল কুরআন লিলজাসসাস ১/৪৫০, আল মাকালাতুল ফিক্বহিয়্যাহ ২/১৮৩, ফাতাওয়ায়ে উসমানী ৩/৩৩৯)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মাও. জালালুদ্দীন
মাস্টারপাড়া, ফেনী।

জিজ্ঞাসা :

আমার বাবা একটি জায়গা মসজিদ ও মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফ করে যান। যেখানে দীর্ঘদিন যাবত একটি পাঞ্জেগানা মসজিদ নির্মাণ করে নামাজ আদায় করা হচ্ছে। এখন পরিকল্পনা করা হয়েছে যে মসজিদটি সম্প্রসারণ করা হবে। এবং এটিকে জামে মসজিদ বানানো হবে বিধায় নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নোগুলোর সমাধান জরুরি।

১। মসজিদের উন্নয়নের জন্য একটি বাসা আছে, যা ভাড়া দেওয়া হয় এবং তার টাকা মসজিদের স্বার্থে খরচ করা হয়। এখন রাস্তা সম্প্রসারণ করার জন্য বাসার অংশ থেকে কিছু জায়গা ক্রয় করে রাস্তা সম্প্রসারণ করা যাবে কি না, যাতে ওয়াক্ফকারীর পরিবারের যাতায়াতে সুবিধা হবে।

২। উক্ত বাসা থেকে যে টাকা আয় হয় এবং জনসাধারণ যে টাকা মসজিদ ফান্ডে দান করে তা একত্র করে মসজিদ ও বাসার বিদ্যুৎ বিল,

গ্যাস বিল, ইমামের বেতন ইত্যাদি দেওয়া যাবে কি না?

৩। বিদেশি কোনো মুসলিম সংস্থা টয়লেট অজুখানা বা মসজিদের কোনো তলা করে দিলে তা নেওয়া যাবে কি না এবং পৌরসভার মসজিদ ও মন্দিরের অনুদান গ্রহণ করার যে ফান্ড আছে সেখান থেকে দরখাস্তের মাধ্যমে টাকা নিয়ে মসজিদ বানানো যাবে কি না?

৪। মসজিদের মেঝেতে ও দেয়ালে টাইলস বা কোনো আয়াত ও সৌন্দর্যবর্ধনের কারুকার্য সাধারণ ফান্ড থেকে করা যাবে কি না?

৫। মসজিদ ফান্ডের টাকা বৃদ্ধির জন্য কোনো হালাল ব্যবসায় লাগানো যাবে কি না?

সমাধান ১ : মসজিদের উন্নয়নের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত বাসা ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয়। তাই বাসার কিছু অংশ ক্রয় করে রাস্তা সম্প্রসারণ করা বৈধ হবে না। (রদ্দুল মুহতার ১/৩৮৩, কিফায়াতুল মুফতি ১০/১০৬)

সমাধান ২ : বাসা ভাড়া দিয়ে যে টাকা আয় হয় এবং মসজিদ ফান্ডে জনসাধারণের সাধারণ দান একত্র করে মসজিদ ও বাসার বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, ইমামের বেতন এবং মসজিদের অন্যান্য খাতে ব্যয় করা যাবে। (রদ্দুল মুহতার ৪/৩৯১, ফাতওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১৮/১৯০)

সমাধান ৩ : শরীয়ত সমর্থিত কোনো মুসলিম সংস্থা অথবা পৌরসভার মসজিদের অনুদান ফান্ড থেকে মসজিদ নির্মাণ, অজুখানা ও অন্যান্য মসজিদসংশ্লিষ্ট কাজের জন্য অনুদান গ্রহণ করা বৈধ। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩৪২, ফাতওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১৫/২৪৩)

সমাধান ৪ : মসজিদের দেয়ালে কোরআন শরীফের কোনো আয়াত লেখা বা মেহরাব অথবা সামনের দেয়ালে চিত্তাকর্ষক কারুকার্য করা অনুচিত। তবে ছাদ বা ডানে-বামে ও পেছনের দেয়ালে চাদাদাতাদের অনুমতি সাপেক্ষে সাধারণ ফান্ড থেকে কারুকার্য করার অবকাশ রয়েছে। (রদ্দুল মুহতার ১/৬৫৮, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া ১০/২৪৩)

সমাধান ৫ : মসজিদ ফান্ডের টাকা বৃদ্ধির জন্য কোনো হালাল ব্যবসায়ও লাগানো বৈধ নয়। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ২/৪৬৩, কিফায়াতুল মুফতী ১০/২৫৩)

খানেকাহে এমদাদিয়া আশরাফিয়া আবরারিয়ার বার্ষিক

এহয়ায়ে সুন্নাত ইজতিমা

৫ ,৬ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হি.

১৭,১৮ ডিসেম্বর ২০১৫ইং

বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থানঃ

জামে মসজিদ, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকা।

(শুধুমাত্র উলামায়ে কেরামদের জন্য)

মলফূজাতে আকাবের

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

নির্জনতার উপায় :

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, বর্তমান যুগে নির্জনতা ও একাগ্রতার মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে। এক বুজুর্গের উক্তি : কোনো কিতাবে দেখেছিলাম যে এই নিয়্যাতে নির্জনতা অবলম্বন করবে না যে মানুষের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকব বরং এই নিয়্যাত হওয়া উচিত যে আমি সাপ-বিচ্ছুর মতো, তাই আমার পৃথক থাকাই উচিত। যাতে আমার অনিষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদে থাকে। আল্লাহু আকবার! আমাদের পূর্বসূরি বুজুর্গগণ উজব তথা (আত্মগর্ব)-এর মতো আধ্যাত্মিক রোগের বিষয়ে কত বেশি সতর্ক থাকতেন; কিন্তু আমাদের এ যুগে এমন পবিত্রাত্মা কোথায় রয়েছে যে এই নিয়্যাতে নির্জনতা অবলম্বন করবে যে আমি আমার অনিষ্ট থেকে মানুষকে মুক্ত রাখব? এ জন্য আমি নিয়্যাতের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করে এরূপ নিয়্যাত করতে বলি যে কতককে আমার অনিষ্ট থেকে বাঁচাব আর কতকের অনিষ্ট থেকে নিজেকে রক্ষা করব। (কামালাতে আশরফিয়্যাহ মলফূয নং ৭৯৫)

অমূল্য বাণী :

শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ জমীরুদ্দীন (রহ.) (প্রতিষ্ঠাতা দারুল উলূম হাটহাজারী) বলেন, প্রকৃত ইলম তা-ই, যা মানুষকে নেক আমল করতে বাধ্য করে।

যদি মানুষ এ পরিমাণ যিকির করে যে তার প্রত্যেক অঙ্গ বরং প্রত্যেক লোম থেকে যিকিরের শব্দ বের হয়, তবে এটা যিকিরের প্রথম স্তর।

হিংসা এবং বেলায়ত তথা অলি হওয়া কখনো এক জায়গায় একত্রিত হতে পারে না, যখন মুরীদের সকল যোগ্যতা পূর্ণতায় পৌঁছে যায় তখন সকল বুজুর্গ এমনিতেই তার দিকে বিশেষ তাওয়াজ্জুহ (অন্তর্দৃষ্টি) প্রদান করে থাকেন। (তাযকিরায়ে জমীর)

ভদ্রতা ও মানবতার ছয়টি কাজ :

হযরত আলী (রা.) বলেন, ছয়টি কাজের মাধ্যমে ভদ্রতা ও মানবতার গুণে গুণান্বিত হওয়া যায়। তিনটি বাড়িতে বসবাসকালীন সময়ে। আর তিনটি সফরে। বাড়িতে বসবাসকালীন সময়ের তিনটি কাজ হলো–

(১) কোরআন মজীদ তিলাওয়াত করা (২) মসজিদসমূহ আবাদ করা। (৩) এমন দোস্তের সংগঠন করা, যারা দ্বীনি কাজে সহায়তা করবে। সফরের তিন কাজ হলো (১) নিজের পাথেয় মুসাফিরদের জন্য খরচ করা। (২) উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া। (৩) সফরসঙ্গীদের সাথে প্রফুল্লতা ও ভদ্রতা বজায় রাখা। (তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ১/২৪৩)

গোনাহের চিকিৎসা :

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, গোনাহের প্রতিকার হলো গোনাহ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তা না করার হিম্মত ও সংকল্প করা। এবং সংঘটিত হওয়ার পর তাওবা করা এ ছাড়া আর কোনো প্রতিকার নেই। কামালাতে আশরফিয়্যাহ মলফূয নং ৪২১

কামেল মুকাম্মালের পরিচয় :

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, কামেল মুকাম্মাল সে-ই, যে সর্বক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পদচিহ্ন ধরে চলে। যার বাহ্যিক অবস্থা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাহ্যিক অবস্থার অনুরূপ হয় এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা হয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অভ্যন্তরীণ অবস্থার অনুরূপ। অর্থাৎ সব বিষয়ে এবং সব অবস্থায় একমাত্র রাসূলই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার একমাত্র আদর্শ এবং অনুসরণীয়। (প্রাগুক্ত মলফূয নং ৯৯)

গোনাহ থেকে বাঁচাই সবচেয়ে বড় ইবাদত :

হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক (রহ.) বলেন, যখন আমরা জেলা প্রশাসককে অসন্তুষ্ট করে আরামে থাকতে পারি না তাহলে যিনি সব প্রশাসকের প্রশাসক তাঁকে অসন্তুষ্ট করে কিভাবে আরামে-নিঃশ্চিন্তায় থাকতে পারি? আজকাল দেখা যায়, সর্ব মহল থেকে পেরেশানির অভিযোগ আসে। কিন্তু এর প্রতিকার কী? সে দিকে লক্ষ রাখা হয় না। তথা সন্তুষ্টি অর্জনের কাজের চিন্তা তো করা হয় কিন্তু যে কাজ সন্তুষ্টি অর্জনের অন্তরায় তা থেকে বাঁচার গুরুত্ব নেই। নবীয়ে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

يا اباهريرة! اتق المحارم تكن اعبد الناس

হে আবু হুরাইরা! হারাম কাজসমূহ থেকে বেঁচে থেকো সবার চেয়ে বড় আবেদ হয়ে যাবে। (মাজালেসে আবরার ১/৯৪)

অধিক যিকির করার উপায় :

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, অধিক পরিমাণে যিকির করার উপায় এই যে চলতে-ফিরতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যিকির করতে থাকবে। কর্মরত অবস্থায় সামান্য উঁচু আওয়াজে যিকির করতে থাকবে। যাতে করে যিকিরের কথা স্মরণ থাকে। অবসর সময়ে তাসবীহ হাতে রাখবে। তাসবীহ হলো 'স্মারক'। এটি হাতে থাকলে যিকিরের কথা স্মরণ থাকে। (কামালাতে আশরফিয়্যাহ, মলফূয নং ৩৮৪)

বন্দরনগরী চট্টলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

জামিয়া মাদানিয়া শুলকবহরের

বার্ষিক সভা

৩,৪ ডিসেম্বর ২০১৫

বৃহস্পতি ও শুক্রবার

এতে সকলে আমন্ত্রিত

সালামান্তে

মুফতী আরশাদ রহমানী

মুহতামিম : জামিয়া মাদানিয়া শুলকবহর চট্টগ্রাম।

যোগাযোগ : ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, ০১৮১৫৬০০৩৫৬

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ

চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩